প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের কুরআন তাফসীর করার পদ্ধতি
  ড. মোহসেন কাসিমপুর
- হাদীসে সাকালাইন ও এর সাথে সাংঘর্ষিক হাদীসের পর্যালোচনা
  সংকলন : মো. আশিফুর রহমান
- 'হাদীসে বিদআ' এর ওপর একটি পর্যালোচনা
  এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর
- নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়
- পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসে হযরত আলী (আ.)
  মিকদাদ আহমেদ
- ঐশী ন্যায়বিচার ও মন্দের অস্তিত্ব
  গোলাম হুসাইন আদিল

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১, এপ্রিল-জুন ২০১২

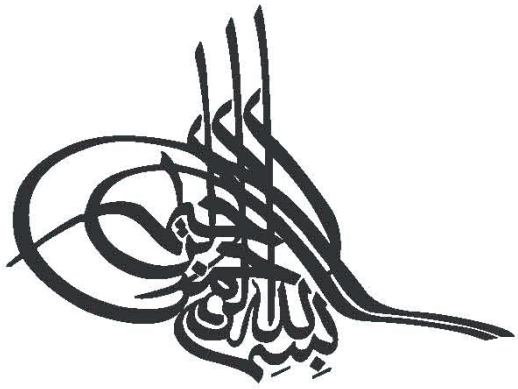

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু
আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১

এপ্রিল-জুন ২০১২

সম্পাদক : **এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**

সহযোগী সম্পাদক : **ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**

নির্বাহী সম্পাদক : **মো. আশিফুর রহমান**

উপদেষ্টামণ্ডলী : মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

এস.এম. আশেক ইয়ামিন

প্রকাশক : মো. আশিকুর রহমান

প্রকাশকাল : চৈত্র ১৪১৮-আষাঢ় ১৪১৯

জমাদিউল উলা-রজব ১৪৩৩ হি.

মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা

যোগাযোগের ঠিকানা : দোকান নং ৩৩৬ (৩য় তলা, দক্ষিণ পার্শ্ব), মুক্তবাংলা

(পরিবর্তিত ঠিকানা) শপিং কমপ্লেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬

ই-মেইল : prottasha.2010@yahoo.com

Prottasha (Vol. 3, No. 1, April-June, 2012), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman; Address: 336 (2nd fl. Right Side), Muktobangla Shopping Complex, Mirpur-1, Dhaka-1216; E-mail: prottasha.2010@yahoo.com

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়**

  আদর্শ পরিবার গঠন– সময়ের দাবি ৭

- **ধর্মতত্ত্ব**

  মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের কুরআন তাফসীর করার পদ্ধতি ১১

  ড. মোহসেন কাসিমপুর

  হাদীসে সাকালাইন ও এর সাথে সাংঘর্ষিক হাদীসের পর্যালোচনা ৩৪

  সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

  'হাদীসে বিদআ' এর ওপর একটি পর্যালোচনা ৭১

  এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

- **নীতি-বিজ্ঞান**

  নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় ৮৩

  সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

- **বিশেষ নিবন্ধ**

  পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসে হযরত আলী (আ.) ১০১

  মিকদাদ আহমেদ

- **দর্শন ও বিজ্ঞান**

  ঐশী ন্যায়বিচার ও মন্দের অস্তিত্ব ১১৫

  গোলাম হুসাইন আদিল

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 3, No. 1, April-June, 2012

Table of Contents

- **Editorial**
  Ideal Family- Necessity of Time 7
- **Theology**
  Method of Tafsir By the Household of Prophet (S.) 11
  Dr. Mohsen Kasimpur
  Hadith-e-Thaqalayn- A Review on it's contradiction 34
  Compilation : Md. Asifur Rahman
  A Review on Hadith-e-Bida' 71
  A.K.M. Anwarul Kabir
- **Ethics**
  Some Issues Related to Ethics and Morality 83
  Compilation: Md. Asifur Rahman
- **Special Article**
  Dignity of Hazrat Ali in the Holy Quran and Hadith 101
  Miqdad Ahmed
- **Philosophy and Science**
  Divine Justice and the Problem of Evil 115
  Ghulam Husayn Adeel

গ্রাহক চাঁদার হার		
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	৬০ টাকা (প্রতি কপি)	২৪০ টাকা (বাৎসরিক)

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

আদর্শ পরিবার গঠন– সময়ের দাবি

সম্পাদকীয়

আদর্শ পরিবার গঠন– সময়ের দাবি

সুখি-সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় জীবন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে গঠন করা। কেননা, আদর্শ সমাজের জন্য প্রয়োজন আদর্শ পরিবার। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের প্রথম জীবন যাপন করার স্থান হলো তার পরিবার। শিশুর শিক্ষার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হচ্ছে তার পরিবার। পরিবার একজন শিশুর মানসিকতা গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যদিও একই পরিবার থেকে ভিন্নমুখী চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হতে পারে তারপরও সাধারণভাবে পরিবারের ভূমিকাকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

বস্তুবাদের প্রভাব, মানুষের অসচেতনতা ও অদূরদর্শিতা আজকের দিনে মানুষকে নানা বিপর্যয়কর অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মানুষ ধীরে ধীরে তার প্রকৃত মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সততা, নীতি-নৈতিকতা আজ অনেকের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

মানুষ তার মূল লক্ষ্য থেকে চ্যুত হয়ে পার্থিব বিষয়াদিতে মেতে উঠছে। সকল মূল্যবোধের বিপরীতে অনৈতিকতা, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তি মানুষের মন ও মগজে জেঁকে বসছে। মানুষের আদর্শ হয়ে উঠছে নীতিহীন বিত্তবান অথবা সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিরা। এর বিপরীতে সৎ ও নীতিবানদের দুর্বল ও অক্ষম হিসাবে মনে করা হচ্ছে।

বস্তবাদ মানুষের সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে একপেশে করে দিচ্ছে। আর এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে পারিবারিক মণ্ডলে মূল্যবোধের বিষয়গুলোর চর্চা কমে যাওয়া। যে পরিবার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উন্নত মূল্যবোধ ও রুচিবোধসম্পন্ন মানুষ তৈরি করে এসেছে, সেই পরিবার যেন মানুষ গড়ার সেই প্রাথমিক শিক্ষকের ভূমিকা থেকে অব্যাহতি নিয়েছে।

মানুষ ধীরে ধীরে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হবে এটিই কাম্য। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর এর জন্যই প্রয়োজন রয়েছে সর্বক্ষেত্রে আদর্শ স্থির করে তা অনুসরণের মাধ্যমে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

বস্তুত আদর্শ স্থির করা মানুষের কর্মকাণ্ডকে সুশৃঙ্খল, ভারসাম্যপূর্ণ ও গতিময় করে। আদর্শ স্থির না করে কোন কিছু এগিয়ে নিতে গেলে সেখানে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হবেই। একজন লেখক, একজন সাংবাদিক, একজন ক্রীড়াবিদ, একজন শিক্ষাবিদ– এভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁদের আদর্শ নির্ধারণ করেই অগ্রসর হন। আর যেখানে পূর্ণ মানব হওয়ার পরিক্রমা সেখানে আদর্শ স্থির না করা সবচেয়ে বড় অদূরদর্শিতা; বরং এটিই সর্বাগ্রে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

একটি পরিবার গঠিত হয় একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে। তাই পরিবার গঠনের এ প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়ার শুরুতেই মানুষকে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। এ পদক্ষেপ পূর্ণতার পথে সহায়ক হবে কিনা এটিই মুখ্য বিষয়। বংশপরিচয়, শারীরিক সৌন্দর্য,

সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থনৈতিক অবস্থান নয়, বরং যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তা হলো জ্ঞান, চরিত্র ও ধার্মিকতা। তবে এক্ষেত্রে ধার্মিকতা সবচেয়ে গুরুত্বের দাবিদার। প্রথমেই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আশা করা যায় যে, এটি সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ বয়ে আনবে।

অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক পর্যায়ে কোন আদর্শ পরিবার নির্ধারণ করা কঠিন বলে মনে হলেও মুসলিমদের জন্য তা কখনই নয়। মুসলমানদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও হযরত খাদীজা (রা.)-এর পরিবার আমাদের সামনে রয়েছে। যেখানে বয়সের পার্থক্য ও অন্যান্য বিষয় গৌণ হয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছিল ভবিষ্যৎ কল্যাণকামিতা। জাহেলি যুগে এমন একটি পরিবার গঠিত হয়েছিল যা একটি ঐশী ধর্মের আবির্ভাব ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে পুরোপুরি কল্যাণকর বলে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিবারের পরেই স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা নিয়ে যে পরিবার আমাদের জন্য আদর্শ হয়ে রয়েছে তা হলো হযরত আলী ও হযরত ফাতিমার পরিবার। পরিবার গঠনের শুরু থেকে পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ পরিবার মুসলমানদের জন্য আদর্শস্থানীয়। নৈতিকতা, মানবিকতা ও আত্মত্যাগের সর্বোচ্চ শিক্ষা পাওয়া যায় এ পরিবারে। নিজেরা অনাহারে থেকে ক্ষুধার্তের মুখে খাবার তুলে দেওয়া, সম্পদের অধিকাংশই অসহায়-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, অতিথিদের সেবা করা, প্রার্থনায় অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া, অসম্মান প্রদর্শনের বিপরীতে অন্যকে সম্মান দেওয়ার মতো আদর্শ রয়েছে এ পরিবারে।

ইবাদতের মিহরাবে একনিষ্ঠ ইবাদতকারী– সালাত আদায়কারী, যাঁর সালাতের সময় পা থেকে তীর বের করে নেওয়া হয়; এর পাশাপাশি যুদ্ধের ময়দানে অকুতোভয় বীর ও শত্রুর ওপর প্রবল প্রতাপশালী যোদ্ধাকে পাওয়া যায় এ পরিবারে। বিশুদ্ধ নিয়তে জিহাদ করা এবং নিজ মুখে থুথু নিক্ষেপের পর ক্রোধ সংবরণকারীর আদর্শও আমরা পাই এ পরিবার থেকে।

কায়িক পরিশ্রমে যেখানে দ্বিধা নেই, গরীবের জন্য খাদ্য প্রস্তুতে হাতে ফোস্কা পড়ার ব্যাপারে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই সেই পরিবারের। মহান স্রষ্টার পথে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ও শারীরিক নির্যাতনের পরও চরম ধৈর্যশীলতার শিক্ষা, আর শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এ পরিবারেই। সম্পদের প্রতি নির্মোহ, অথচ অধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার, সত্য ও ন্যায়ের পথে লড়াই করে সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণা আসে এ পরিবার থেকেই। আর তাই এ পরিবার থেকে বেহেশতের দু'জন নেতার আবির্ভাব আমাদের বিস্মিত করে না।

তাই আজ আমাদের সর্বাগ্রে সেই কল্যাণময় পরিবার গঠনের কথাই চিন্তা করতে হবে যেখানে নিজেদের বিষয় নয়, অন্যের বিষয় প্রাধান্য পাবে; ভোগ নয়, সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার শিক্ষা থাকবে; অন্যায়ের মোকাবিলায় বজ্রকঠিনভাবে রুখে দাঁড়ানোর মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে। আর তাহলেই সময়ের দাবি পূরণ হবে। নতুবা দিন দিন আমরা কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মতো ভাসতে থাকব। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলব সবকিছুর ওপর থেকে।

ধর্মতত্ত্ব

মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের তাফসীর করার পদ্ধতি

হাদীসে সাকালাইন ও এর সাথে সাংঘর্ষিক বলে দাবি করা হাদীসসমূহের ওপর পর্যালোচনা

‘হাদীসে বিদআ’ এর ওপর একটি পর্যালোচনা

মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের তাফসীর করার পদ্ধতি

ড. মোহসেন কাসিমপুর

সার-সংক্ষেপ

আল-কুরআনের মুফাস্‌সিরদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এর আয়াতগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কারণে মুফাস্‌সিররা বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাফসীর লিখেছেন যেগুলোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটির সাথে অপরটির সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ ধরনের পার্থক্যের রহস্য মুফাস্‌সিরদের তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত ভিত্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগত ভিত্তির ছায়ায় তাফসীরের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারিত হয়। এর মধ্যে রাসূল (সা.)-এর আহলে বাইত (আ.)– যাঁরা কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাকারী, তাঁদের নিজ নিজ যুগে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র যতটা অনুকূলে ছিল শেষ আসমানী গ্রন্থ কুরআনের ততটাই তাফসীর করেছেন। কুরআনের ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টি সামগ্রিকতা ও পূর্ণতার দিক থেকে এবং বাহ্যিক ও আত্মিক দিক থেকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ মূলনীতির কারণে আহলে বাইতের তাফসীরের শিক্ষা– যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুরআনের বিষয়বস্তু এবং ভাবার্থের শিক্ষা– তাফসীর করার পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। এ প্রবন্ধে তাঁদের তাফসীর করার পদ্ধতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

কুরআন সর্বজনীন ঐশী ওহীনামা। যার শিক্ষা সময় এবং স্থানের ঊর্ধ্বে। দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাগ্রহণ না করা উম্মী রাসূল (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরবি ভাষায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি কুরআন নিজেই সত্যায়ন করেছে।

'(ঐ সকল ব্যক্তি) যারা এই রাসূল উম্মী নবীর অনুসরণ করে– যাকে (যার নাম ও বৈশিষ্ট্য) তারা তাদের নিকট বিদ্যমান তাওরাত ও ইনজিলে লিপিবদ্ধ পায়– সে (নবী) তাদের সৎকর্মের নির্দেশ দেয় ও অসৎকর্মে নিষেধ করে।' (সূরা আরাফ : ১৫৭)

'আমরা কুরআন আরবি ভাষায় প্রেরণ করেছি যেন তোমরা চিন্তা করতে পার।' (সূরা যুখরুফ : ৩)

আরব উপদ্বীপে ইসলামের শুরুতে মুসলমানদের কুরআনের আয়াতের অর্থ ও বিষয়বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা ছিল বেশি। কারণ, কুরআন তাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যখন কোন আয়াত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হত তখন তাদের বেশিরভাগ মানুষই, এমনকি রাসূলের কোন কোন নিকটবর্তী সাহাবীও এ সকল আয়াতের বিষয়বস্তু অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন না। তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী আয়াতের অর্থ বোঝার জন্য রাসূল (সা.)-এর নিকট যেতেন এবং প্রশ্ন করার মাধ্যমে উত্তর জেনে নিতেন। সূরা নাহ্‌লের ৪৪ নং আয়াতে এ বিষয়ে ইশারা করা হয়েছে।

'এবং আমরা তোমার প্রতি স্মরণকারী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি তা মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা কর যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে তারা চিন্তা করে।' (সূরা নাহ্‌ল : ৪৪)

কুরআনের আয়াত অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতী দায়িত্ব হলো এর আয়াতসমূহের তাফসীর করা। এ বিষয়ে অনেক দলিল-প্রমাণ রয়েছে। যেমন আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেছেন : 'আমাদের প্রত্যেকে যখন দশটি আয়াত শিখতাম, তখন রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে অন্যান্য আয়াত শুরু করার পূর্বে এ আয়াতগুলোর অর্থ এবং এগুলোর আমল করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতাম।' (জামিউল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮)

এ কারণে বলা সম্ভব কুরআনের তাফসীর বাস্তবে রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই শুরু হয়েছে। কুরআনের প্রথম মুফাস্‌সির হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। উল্লেখ্য, রাসূল (সা.)-এর তাফসীর তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনের মতই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। (জামিউল আহকামুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭)।

হিশাম ইবনে আতিয়া থেকে আওজায়ীর বর্ণনা অনুসারে, 'যখন ঐশী ওহী অবতীর্ণ হত, তখন জিবরাইল (আ.) তাফসীর হিসেবে এর রীতি-নীতিও (সুন্নাত) রাসূলের জন্য নিয়ে আসতেন।' (আল কিফায়া ফি ইলমিল রেওয়ায়া, পৃ. ৪)।

প্রথম দিকের তাফসীরগুলো বর্ণনা ও হাদীস আকারে ছিল। ইতিহাসে যে সকল প্রচলিত তাফসীর উপস্থাপন করা রয়েছে সেগুলো শুরুতে রাসূল (সা.)-এর হাদীস দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। রাসূল (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের অনুসারীরাও কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশের কারণে রাসূল (সা.)-এর বর্ণনাকে কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে করে, কিন্তু সাহাবী ও তাবেঈনদের তাফসীর গ্রহণ করে না। (কুরআন দার ইসলাম, পৃ. ৫৭)

প্রথম তাফসীরকার রাসূল (সা.) কুরআনের সকল আয়াতের তাফসীর করতে পেরেছিলেন, নাকি তা শেষ করার পূর্বেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে এবং এই প্রবন্ধে এ বিষয়টি উপস্থাপন করাও সম্ভব নয়।

মরহুম শহীদ বাকির সাদ্‌র এর একজন ছাত্রের মত অনুসারে, রাসূল (সা.) শ্রোতাদের অনুধাবন করার ক্ষমতা অনুসারে দুই ধরনের তাফসীর করতেন। আলী (আ.)-এর মত বিশেষ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কুরআনের সকল আয়াতের তাফসীর করেছেন। অপরদিকে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন অনুসারে তিনি কুরআনের কিছু আয়াতের তাফসীর করেছেন। (উলুমুল কুরআন, পৃ. ৯৮)

সাহাবীদের যুগ কুরআনের তাফসীরের দ্বিতীয় অধ্যায়। এ যুগেও কুরআনের তাফসীর রাসূল (সা.)-এর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁদের মধ্যে আলী (আ.) সবচেয়ে বিজ্ঞ মুফাস্‌সির সাহাবী ছিলেন। (মুহাররারুল ওয়াজির, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮)। এরই ধারাবাহিকতায় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, আবি ইবনে কা'আবের স্থান রয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকের তাফসীরের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরন রয়েছে। তাঁদের তাফসীরের মূল বৈশিষ্ট্য হলো : সাধারণ, তর্কবিতর্ক থেকে মুক্ত, নিজস্ব মত এবং শুধু বর্ণনা দ্বারা সীমাবদ্ধ।

তাবেঈনদের যুগে বিখ্যাত মুফাস্‌সিরদের কেন্দ্র করে তাফসীর পথ পরিক্রমণ করেছে। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুজাহিদ ইবনে জাবর মাক্কী (মৃত্যু : ১০৪ হিজরি), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (মৃত্যু : ৯৫ হিজরি), তাউস ইবনে কিসানে ইয়ামানী (মৃত্যু : ১০৬ হিজরি), আতা ইবনে আবি রিয়াহ (মৃত্যু : ১১৪ হিজরি)। এ অধ্যায়ের বিশেষ কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ যুগে তাফসীরের সীমানা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আরবির ব্যাকরণগত দিক, শব্দ-পরিচিতি, ইজতিহাদ এবং এ সকল ক্ষেত্রে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারের বিষয়টি মুফাস্‌সিরদের নজরে আসে। এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাফসীরের মধ্যে

ইসরাঈলীয়াত অর্থাৎ জাল হাদীসের প্রবেশ; যার মূল কারণ হল ইহুদী ও খ্রিস্টান আলেমদের ইসলাম গ্রহণ।

তাফসীরের ইতিহাস আলোচনার একটি অসম্পূর্ণ দিক হলো মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইত কর্তৃক তাফসীরের ঘটনাপ্রবাহের বিষয়টি উপস্থাপিত না হওয়া। দুঃখের বিষয় হলো যাঁরা তাঁদের গবেষণা এবং পর্যালোচনাকে ইতিহাস এবং ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি নির্দিষ্ট করেছেন তাঁরা আহলে বাইতের তাফসীরের ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনা করেননি। অথচ তাঁরা গভীরভাবে সাহাবী এবং তাবেঈনদের তাফসীরের ঘটনাপ্রবাহের পর্যালোচনা করেছেন। মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরার শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে তাফসীরের ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আহলে বাইতের তাফসীরের উৎপত্তিগত দিক এবং তা বিস্তারের কোন আলোচনা সেখানে হয়নি। এক কথায় আইলে বাইতের তাফসীরের বিশেষত্ব সম্পর্কে কোন আলোচনাই আসেনি।

মুহসেন আমিন 'আমেলী ত্রিশের অধিক মুফাস্সিরের নাম উল্লেখ করেন যাঁরা ইমামগণের শিষ্য ছিলেন। (আ'ইয়ানুশ শিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭)

কোন কোন মুফাস্সির হাদীসশাস্ত্রের সূচিপত্র রচনাকারীদের বক্তব্য অনুসারে তাফসীর রচনা করেছিলেন, যেমন : মাইসামে তাম্মার, জাবির ইবনে ইযাজীদ জো'ফী, আবু জুনাদে হাসীন ইবনে মুখারেক সালুলী, মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ বারকী এবং ইউনুস ইবনে আবদুর রহমান। (আ'ইয়ানুশ শিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫-১২৭ এবং আল-ফিহ্রিস্ত, পৃ. ৩৫৯) উল্লিখিত সাহাবীরা পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম ইমামের তাফসীরের আলোচনা থেকে লাভবান হয়েছেন। এ প্রবন্ধে এ তাফসীরগুলোর ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং আহলে বাইতের তাফসীরের বিশেষ রূপ বর্ণনা করার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) জ্ঞানগত কর্তৃপক্ষ এবং তাঁদের রীতি-নীতির মূল্যায়ন

আহলে বাইত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধর। রাসূল (সা.) তাঁর আহলে বাইতকে তাঁর উম্মতের মাঝে চিরদিনের জন্য স্মৃতির নিদর্শন হিসাবে রেখে গেছেন এবং কুরআনের সাথে স্থান দিয়েছেন। শেষ নবী (সা.)-কে প্রেরণকারী আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টিকে (কুরআন ও আহলে বাইত) 'সাকালাইন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা কিয়ামত দিবসে হাউজ কাউসারে পৌঁছার পূর্বে একে অপর থেকে আলাদা হবে না। (সুনানুত তিরমিজী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৬২-

৬৬৩; মুসনাদে আহ্মাদ ইবনে হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪ এবং আল-মুসতাদরাকু আ'লাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে আসা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কুরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে আহলে বাইত হলো জ্ঞানগত কর্তৃপক্ষ। কুরআন ও আহলে বাইতের একে অপরের সঙ্গী হওয়া এবং কুরআন ও আহলে বাইতের (কিয়ামত পর্যন্ত) একই পথে পদচারণার বিষয়টি রাসূল (সা.)-এর যোগ্য উত্তরসূরি আহলে বাইতের কুরআন সম্পর্কে অতুলনীয় জ্ঞানকেই প্রকাশ করে। অন্য কথায়, তাঁদের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব এ হাদীসটির স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। আলী (আ.)-এর বক্তব্য এ বিষয়টির গুরুত্বকে বৃদ্ধি করে। তিনি বলেছেন : 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দূষণ এবং গুনাহের ফাঁদে পড়া থেকে রক্ষা করেছেন। আমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের সাক্ষী এবং হেদায়াতকারী। আমরা কুরআনের সাথে এবং কুরআন আমাদের সাথে রয়েছে যা কখনই একে অপর থেকে আলাদা হবে না।' (উসূলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১; বিহারুল আনওয়ার, ৩৩তম খণ্ড, পৃ. ২৭০)

আহলে বাইতের তাফসীরের পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতার দলিল কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। কুরআনের এ আয়াত দ্বারা বিষয়টি প্রমাণ করা সম্ভব– 'যদি তোমরা না জেনে থাক, তবে আহলে যিক্রকে (কুরআনের জ্ঞান যাদের নিকট রয়েছে তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর।' (সূরা নাহ্ল : ৪৩)

এ আয়াতটির মূল বিষয়বস্তু অজ্ঞ-মূর্খদেরকে জ্ঞানীদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতার বিষয় নির্দেশ করে। আহলে যিক্রের বক্তব্য ও বর্ণনা গ্রহণযোগ্য দলিল হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে তাদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করা যুক্তিযুক্ত। তা না হলে তাদের নিকট জ্ঞান অর্জন অযৌক্তিক হবে। শিয়া-সুন্নী উভয় মাযহাবের সূত্রে আহলে বাইত (আ.) আহলে যিক্রের বাস্তব উদাহরণ। (শাওয়াহেদুত তানজীল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২; ইহকাকুল হাক্ব, ৩য় খণ্ড, ৮৪২)। এ কারণে 'আহলে যিক্র কারা?'– এ প্রশ্নের উত্তর 'আহলে বাইত (আ.)' স্বতঃসিদ্ধ। আহলে বাইতের কুরআন বিষয়ক মত দলিল এবং সনদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। (আল-মীযান, আল্লামা তাবাতাবাঈ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪)

সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াত–যে আয়াতকে পবিত্রতার আয়াত (আয়াতে তাতহীর) বলা হয়–এক্ষেত্রে উপযোগী। এ আয়াতের মূল বিষয়বস্তু সকল ধরনের দূষণ হতে আহলে বাইতের সর্বজনীন পবিত্রতার প্রতি নির্দেশ করে। যদি এ আয়াতে দূষণের একটি বাস্তব

বিষয় অজ্ঞতা ও মূর্খতা হয় তাহলে আহলে বাইতের ইমামগণ এ দূষণ থেকেও মুক্ত। ফলে তাঁদের বক্তব্য এ দিক থেকে পরিপূর্ণ।

সাকালাইনের হাদীস ব্যতীত রাসূল (সা.)-এর আরেকটি হাদীস রয়েছে যা 'নৌকার হাদীস' (হাদীসে সাফিনাহ্) নামে প্রসিদ্ধ। (আল-মাআ'রিফ, পৃ. ২৫২; আসরারে আলে-মুহাম্মাদ, পৃ. ৬৫৩)। রাসূল (সা.) এ হাদীসে তাঁর আহলে বাইতকে নবী নূহ (আ.)-এর নৌকার সাথে তুলনা করেছেন। যারা এ নৌকায় আরোহণ করবে তাদের পরিণতি নবী নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণকারী মুসাফিরদের মত– তারা ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে।

আহলে বাইত কর্তৃক তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা

ধর্ম বিষয়ক গবেষণাকারীরা ধর্মীয় জগতে ভুল ধারণা, ভুল তাফসীর ও অপ্রকৃত ব্যাখ্যা করেছেন এবং অনেক বিষয় বিকৃত করেছেন। অনেক অনুমানভিত্তিক অর্থহীন ভুল সিদ্ধান্ত নতুন মাযহাব সৃষ্টির কারণ হয়েছে। ইসলামী জগতে রাসূল (সা.)-এর তিয়াত্তরটি ফেরকা বা দল হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী এ ধরনের দাবিরই উপযুক্ত দলিল। এ কারণে শত্রুর মোকাবিলায় প্রকৃত ওহী এবং এর বাস্তবতা রক্ষা করতে সার্বিক কর্মতৎপরতা চালাতে অনেক কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলোর অন্যতম কঠিন অবস্থা অথবা বলা যায় সবচেয়ে কঠিন অবস্থা হলো কুরআনের এ ধরনের ভুল তাফসীর এবং অপ্রকৃত ব্যাখ্যা।

মুত্তাকীদের নেতা আলী (আ.) যখন খারেজীদের উদ্দেশে আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখার জন্য দূত প্রেরণ করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন : 'তাদের (খারেজীদের) কাছে কুরআন থেকে কোন দলিল পেশ করো না। কারণ, কুরআন বিভিন্নভাবে তাফসীর করা সম্ভব।' (নাহজুল বালাগা, ৭৭ নং চিঠি)

ঠিক এ রকম বিষয়বস্তুর হাদীস রাসূল (সা.) থেকে আবি যুমহুর ইহসায়ী এভাবে বর্ণনা করেছেন : 'কুরআন বিভিন্নভাবে তাফসীর করা সম্ভব, সর্বোত্তমভাবে এর তাফসীর কর।' (আ'ওয়ালীউল লায়ালী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৪)

এ বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর আরেকটি হাদীস রয়েছে যা কুরআনের অর্থগত বিকৃতি নিয়ে তাঁর আশংকা প্রকাশ করে– 'আমার পরে যে বিষয় নিয়ে আমি উম্মতের জন্য সবচেয়ে চিন্তিত তা হলো কোন ব্যক্তি কুরআন হাতে নিয়েছে (অর্থাৎ তাফসীর করে); কিন্তু একে

(অর্থকে) এর স্বস্থানে রাখেনি (অর্থাৎ অর্থগত বিকৃতি সাধন করেছে)।' (বিহারুল আনওয়ার, ৮৯তম খণ্ড, পৃ. ১১২)

এ ধরনের উদাহরণ তাফসীরের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির নির্দেশক যার বর্ণনা কিছু পূর্বে এসেছে। এখন এ সমস্যার সমাধান কী? রাসূল (সা.) তাঁর সর্ব সময়ের উত্তরাধিকার ওহী সংরক্ষণের উপায় নিয়ে চিন্তা করেছেন, আর তা হলো আহলে বাইতকে আমাদের মাঝে পরিচয় করিয়েছেন– যে সম্পর্কে ইশারা করা হয়েছে। আহলে বাইতের তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করাই যথেষ্ট, আর তা হলো তাবেঈন এবং এর পরবর্তী সময়ে তাফসীরের ঘটনাপ্রবাহে বিভিন্ন পদ্ধতির তাফসীরের উদ্ভব হয়। এ বিভিন্ন পদ্ধতির তাফসীরের কারণে উম্মতের দিশেহারা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ও তারা সঠিক ওহীর শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছে এবং নবুওয়াতের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

আহলে বাইতের তাফসীরের প্রয়োজনীয়তা নিষ্পাপ ইমামদের বাক্যগুলোতে লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা সম্ভব। আলী (আ.) বলেছেন : 'এ কিতাব নীরব এবং বোবা। এই কুরআন পুস্তকের বাঁধাইকৃত খণ্ডের মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে। এই কুরআন জিহ্বা ও ভাষা ছাড়া কথা বলে না। অবশ্যই এর অনুবাদ প্রয়োজন। নিশ্চয়ই কুরআনের পক্ষ থেকে মানুষ কথা বলে।' (নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১২৫; ওয়াসায়েল, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ২০)

হযরত আলী (আ.)-এর বর্ণনা অনুসারে কুরআন এমন একটি নীরব গ্রন্থ যার বিষয়বস্তু অন্যদের বর্ণনা করতে হয়। এ সম্পর্কে ইমামের অন্যান্য বক্তব্যের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

'এ কুরআনকে কথা বলাও।' (নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৫৮)

'কুরআন আদেশ দানকারী এবং রক্ষাকারী, নীরব কিন্তু সবাক।' (নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৮৩)

ইমাম বাকির (আ.) থেকেও এ বিষয়ে রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে যা আলোচনায় উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক নয়। সালামাহ্ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন : 'আমাদের যে জ্ঞান দান করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে কুরআনের তাফসীর ও এর আহকামসমূহের জ্ঞান এবং সময় এবং এর উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান... যদি কোন বিশ্বস্ত পাত্র খুঁজে পেতাম তাহলে তার কাছে কুরআনের তাফসীর করতাম।' (উসূলে কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩২) নিঃসন্দেহে

ইমামদের ওহীর রহস্য ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ ছাত্র ছিলেন। তাঁদের উচ্চ আত্মা এবং বুদ্ধিবৃত্তির কারণে ইমাম বাকির (আ.)-এর নিকট থেকে তাঁরা ঐশী জ্ঞান লাভ করতেন।

আহলে বাইতের দৃষ্টিতে তাফসীর এবং মুফাস্‌সির

'তাফসীর' (বাহ্যিক অর্থে ব্যাখ্যা) এবং 'তা-ভীল' (অভ্যন্তরীণ অর্থে ব্যাখ্যা) দু'টি ভিন্ন বিষয়। 'তা-ভীল' পরিভাষাটি সাধারণত তাফসীরের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এ সম্পর্কিত জ্ঞান রাসূল (সা.) এবং তাঁর বংশোদ্ভূত পবিত্র ইমামদের জন্যই নির্দিষ্ট। রাসূল (সা.) এবং ইমামদের নিকট থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াত এ বিষয়টি নির্দেশ করে। ইমাম সাদিক (আ.)-এর দৃষ্টিতে সূরা হুজুরাতের ৯ম আয়াত সেসব ব্যক্তির বাস্তব উদাহরণ যারা আলী (আ.)-এর বিরুদ্ধে উটের যুদ্ধে (জঙ্গে জামাল) অংশগ্রহণ করেছিল। (কাফী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮০)। এ আয়াতের মধ্যে যে বিধানগুলো লুক্কায়িত রয়েছে তা হলো এ আয়াতটিতে উল্লিখিত দু'টি গোষ্ঠী কারা, সন্ধির শর্ত কি, কোন পরিস্থিতিতে তাদের হত্যা করা যাবে এবং ন্যায়পরায়ণতার বাস্তব দৃষ্টান্ত কিভাবে নির্ধারিত হবে। এ আয়াতের শব্দ এবং ভাবার্থ সুস্পষ্ট। কিন্তু এর বাস্তব দৃষ্টান্ত নির্ধারণ সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কারণে কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা দৃঢ় ও নিশ্চিত জ্ঞানের অধিকারীদের হাতে। মাসুম ইমামগণ কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কুরআনের এমন অর্থ ও ব্যাখ্যা যার সাথে শাব্দিক (বাহ্যিক) অর্থ এবং তাফসীরের কোন সম্পর্ক নেই– এ ধরনের অপব্যাখ্যা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম বাকির (আ.) কাতাদাহকে (মৃত্যু : ১১৭ হিজরি) প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ছাড়া তাফসীর করার কারণে তিরস্কার করেছেন। (সাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭) ইমামের উদ্দেশ্য এটা না যে, কাতাদাহ শাব্দিক অর্থ ও ব্যাকরণগত দিক এবং অলংকার শাস্ত্র সম্পর্কে জানেন না; বরং এ তিরস্কার সঠিক পদ্ধতির অনুসরণ না করা এবং কুরআনের গভীরতা সম্পর্কে না জানার কারণে ছিল। (তাফসীরে সাফীর দ্বিতীয় ভূমিকা : ৫৯ নং পৃষ্ঠা। প্রসিদ্ধ এক ফকিহ সম্পর্কে এসেছে যে, ইমাম বাকির তাঁকে কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।

কুরআনের অভ্যন্তরীণ অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রসঙ্গটি ছাড়াও ইমামদের দৃষ্টিতে বাহ্যিক তাফসীরের ক্ষেত্রেও বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। অন্য বিজ্ঞ এবং পণ্ডিতরাও তাফসীরের জন্য উলুমুল কুরআনের জ্ঞান থাকার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কুরআন ভালভাবে অনুধাবন করার জন্য ব্যবহৃত কুরআন সংশ্লিষ্ট সার্বিক বিদ্যাকে 'উলুমুল কুরআন' বলা

হয়। যেসব বিদ্যা কুরআনের তাফসীরের ভূমিকা অথবা পূর্ব শর্তের বিদ্যা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন কোন্ আয়াত পূর্ববর্তী আদেশ বাতিল বা পরিবর্তনকারী এবং কোন্ আয়াতের আদেশ বাতিল বা পরিবর্তিত হয়েছে (নাসেখ ও মানসূখ)– এ সংক্রান্ত বিদ্যা, সুস্পষ্ট ও সাদৃশ্যের আয়াত (মুহকাম ও মুতাশাবেহ) সংক্রান্ত বিদ্যা, আয়াতের শানে-নুযূল সংক্রান্ত বিদ্যা, সর্বসাধারণ ও বিশেষ ('আম ও খাস) আয়াত সংক্রান্ত বিদ্যা, নিঃশর্ত ও শর্তযুক্ত (মুতলাক ও মুকাইয়াদ) আয়াত সংক্রান্ত বিদ্যা– এসব বিদ্যা ছাড়া কুরআনের আয়াত থেকে কুরআন তাফসীর করা সম্ভব নয়। (খিসাল, পৃ. ২৫৬; আসরারে আলে-মুহাম্মাদ, পৃ. ২৭০)। ইমাম আলী (আ.) অন্য একটি বক্তব্যে বিষয়টি সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, কুরআনের বিষয়বস্তু হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধসম্বলিত। (নাহজুল বালাগা, ১ম খুতবা)।

এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, মুফাস্সিরের তাফসীর করার ক্ষেত্রে এ সকল দিকের ওপর দক্ষতা থাকতে হবে। রাসূল (সা.) এবং মাসুম ইমামগণ নিজের মত অনুসারে তাফসীর (তাফসীর-বির-রায়) করার ক্ষেত্রেও কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন। বাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : 'যে ব্যক্তি নিজের মতামত অনুসারে তাফসীর করে, আল্লাহ্ আগুন দিয়ে তার বসার স্থান সৃষ্টি করেন।' (সাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০)। অথবা ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি নিজের মতামত অনুযায়ী তাফসীর করে, কিন্তু কাকতালীয়ভাবে যদি তার তাফসীর সঠিকও হয়, তবুও সে কোন সওয়াবের অধিকারী হবে না।' এ সকল রেওয়ায়াত নিজের মত অনুযায়ী তাফসীর করার বিষয়টি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় নির্দেশ করে।

আহলে বাইত কর্তৃক তাফসীর করার পদ্ধতি

মুফাস্সিররা আয়াতের শব্দ এবং এর অর্থ আবিষ্কারের জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে তাফসীরের ধরন বা পদ্ধতি বলে। যদিও তাফসীরের গবেষকদের দৃষ্টিতে এর পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হতে পারে। (আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৬-১৪৯)। কিন্তু সাহাবীদের যুগ থেকে এ পর্যন্ত সার্বিকভাবে কুরআনের দুই ধরনের তাফসীর পরিলক্ষিত হয়েছে। একটি হচ্ছে বর্ণনামূলক তাফসীর পদ্ধতি, অপরটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও গবেষণামূলক তাফসীর পদ্ধতি।

বর্ণনামূলক তাফসীর পদ্ধতির অর্থ হলো কুরআনের আয়াতকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবী (আহলে সুন্নাত এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী) এবং মাসুম ইমামগণের বর্ণনা অনুযায়ী তাফসীর করা। কোন কোন গবেষকের মতে কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াতের তাফসীরের পদ্ধতি এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্সিরুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩; উসুলুত তাফসীর ওয়া কাওয়ায়েদুহু, পৃ. ১১১; আল-মাবাদিউল 'আম্মা লিত-তাফসীর, পৃ. ৫৫)।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে মুফাস্সির নিজের চেষ্টায় কুরআনের আয়াত তাফসীর করেন। এ ধরনের তাফসীরবিদরা রেওয়ায়াত থেকেও উপকৃত হন, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা তাঁদের তাফসীরের মূল ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ সার্বিক পদ্ধতি থেকে কালামী অর্থাৎ বিশ্বাস সংক্রান্ত, শাব্দিক, দার্শনিক, ইরফানী এবং ফিকাহ্ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম লাভ করে।

এখন প্রশ্ন হলো আহলে বাইত (আ.)-এর তাফসীর পদ্ধতির সাথে এ পদ্ধতিগুলোর সম্পর্ক কী? যদি সাহাবী এবং তাঁদের ছাত্রদের মাধ্যমে লিখিত অথবা অন্যের আলোচনায় সন্নিবেশিত আহলে বাইতের তাফসীরগুলোর পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাব, তাঁরা এক্ষেত্রে বিশেষ মূলনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ইমামগণ কুরআনকে সামগ্রিক, পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ সূত্র হিসেবে বিশ্বাস করতেন। এ কারণে তাঁদের বর্ণনামূলক তাফসীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়, সামাজিক এবং হুকুম-আহকামের বিষয় উল্লেখযোগ্য। তাঁরা কুরআনের আয়াতের ক্ষেত্রে যাহেরী বা বাহ্যিক দিক এবং বাতেনী বা অন্তর্নিহিত দিকে বিশ্বাসী ছিলেন। (এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪১; সাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৬)। এ শক্তিশালী মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ইমামদের তাফসীর পদ্ধতির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা সম্ভব।

কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর

বিখ্যাত মুফাস্সিরদের বর্ণনামূলক তাফসীরের রেওয়ায়াতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর করার পদ্ধতি অনেক পুরাতন যুগ থেকে প্রচলিত ছিল। (আল-মিজান, আল্লামা তাবাতাবাঈ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫)। আল্লামা তাবাতাবাঈ বিশ্বাস করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং আহলে বাইতের ইমামগণ

কুরআনের তাফসীরের জন্য তত্ত্বগত জ্ঞান এবং কোন বৈজ্ঞানিক মতের সাহায্য গ্রহণ করতেন না। (প্রাগুক্ত)।

কুরআন মানবজাতির হেদায়াতের জন্য সব কিছুর বর্ণনাকারী। প্রশ্ন হলো তাহলে কেন কুরআনের ভেতরে নিজ সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে না? ইমামগণ এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর করার পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

আলী (আ.) সূরা ফাতিহার ৬ নং আয়াত, 'আমাদেরকে সরল পথে হেদায়াত কর'-কে সূরা নিসার ৬৯ নং আয়াতের মাধ্যমে তাফসীর করেছেন যেখানে আল্লাহ বলেছেন : 'আর কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করে, সে নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন।' (বিহারুল আনওয়ার, ৬৫তম খণ্ড, পৃ. ৭৮; তাফসীরে ইমাম হাসান আসকারী, পৃ. ৫০)

তিনি সূরা বাকারার ১২৪ নং আয়াতে যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : 'আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়'– এ আয়াতে বর্ণিত 'যালিম'কে সূরা লোকমানের ১৩ নং আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন যেখানে হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন : 'হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক কর না, নিশ্চয়ই শির্ক চরম যুল্ম (অত্যাচার)' অর্থাৎ যুলুমকে শির্ক হিসেবে তাফসীর করেছেন। (নূরুস সাকালাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১-১২২; ইহতিযায, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১)

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) সূরা বাকারার ৬ নং আয়াতে কুফ্র এবং এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আলোচনায় নিম্নলিখিত আয়াতসমূহকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন :

'তারা অন্যায়ভাবে এবং উদ্ধতভাবে নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল।' (সূরা নাম্ল : ১৪)

'এটা আমার প্রতিপালকের দয়া ও অনুগ্রহ, যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞ থাকি?' (সূরা নাম্ল : ৪০)

'যখন তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং 'তূর'-কে তোমাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেছিলাম'...'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান কর?' (সূরা বাকারা : ৬৩ ও ৬৫)

'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের গোত্রকে বলেছিল : তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি এবং চিরকালের জন্য তোমাদের সাথে আমাদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন।' (সূরা মুমতাহিনাহ : ৪)

এ রকম অনেক উদাহরণ রয়েছে। ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর দৃষ্টিতে কুফ্‌রের বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। এ সকল আয়াত থেকে কুফ্‌রের তীব্রতা ও ক্ষীণতার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়।

ইমাম বাকির (আ.)-এর তাফসীরের মধ্যে কিছু ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যায় যে, যদি কোন আয়াতে কঠিন অথবা বোধগম্য নয় এমন শব্দ থাকে সেক্ষেত্রে তিনি অন্য আয়াতের সাহায্যে সে শব্দটির অর্থ করতেন। উদাহরণ হিসেবে রূহ বা আত্মা কী? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি সূরা ওয়াকি'আর ৮-১১, বাকারার ২৫৩, মুজাদালার ২২, নাহ্‌ল এর ৭০ নং আয়াতকে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ পদ্ধতিকে ইমামদের তাফসীর পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ তাফসীরে ইমাম বাকির (আ.) নবীদের পবিত্র আত্মার অধিকারী এবং ডান দিকের দলকে ঈমানী শক্তির আত্মার অধিকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাম দিকের দল এ ধরনের আত্মার অধিকারী নয়, কিন্তু এর পরিবর্তে তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ এবং দৈহিক শক্তিসম্পন্ন আত্মার কথা উল্লেখ করেছেন। (বাসায়েরুদ দারাজাত, পৃ. ৪৬৮)

ইমামদের কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর করার আরেকটি দিক হলো সাদৃশ্যের (মুতাশাবেহ) আয়াতকে সুস্পষ্ট (মুহকাম) আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। ইমাম জাফর সাদিক (আ.) সূরা যুখরুফের ৫৫নং আয়াত, 'যখন তারা আমাদেরকে ক্রোধান্বিত এবং দুঃখিত করল তখন আমরা তাদের শাস্তি দিলাম এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম'– এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : 'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মত ক্রোধান্বিত এবং দুঃখিত হন না; বরং আল্লাহ্‌র দুঃখ এবং সন্তুষ্টি তাঁর রাসূল (সা.) এবং আউলিয়াদেরই দুঃখ এবং সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত। অন্য কথায়, রাসূল (সা.) এবং আউলিয়াদের দুঃখ ও সন্তুষ্টিই হলো আল্লাহ্‌র দুঃখ ও সন্তুষ্টি।' (শেখ সাদুক, তাওহীদ, পৃ. ১১৯-১২০)।

এরকম সাদৃশ্যের (মুতাশাবেহ) আয়াতকে সুস্পষ্ট (মুহকাম) আয়াতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার অরেকটি নমুনা হলো সূরা নিসার ৮০ নং আয়াত, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে

সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল এবং যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়, তোমাকে তাদের রক্ষাকারী হিসেবে প্রেরণ করিনি'– এ আয়াতকে সূরা ফাত্‌হের ১০ নং আয়াত, 'যারা তোমার হাতে বাইআত গ্রহণ করে তারা আল্লাহ্‌র হাতে বাইআত গ্রহণ করে'-এর মাধ্যমে তাফসীর করেছেন।

বর্ণনামূলক তাফসীর

মাসুম ইমামদের বক্তব্য রাসূল (সা.)-এর বক্তব্যের মতই অকাট্য– এটা আহলে বাইতের অনুসারীদের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে হাদীসের সনদ এবং বিষয়বস্তুর যে সকল মূলনীতি রয়েছে সেগুলো রক্ষা করা হলে ইমামদের হাদীস রাসূল (সা.)-এর হাদীসের সমপর্যায়ের মর্যাদাসম্পন্ন হবে। (তিবইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭)। (বিষয়টি মূলত এ কারণে যে, উভয় হাদীসের মূল উৎস ঐশী)।

ইমাম বাকির (আ.)-এর নিকট থেকে যে হাদীস শেখ মুফিদ (আমালী, পৃ. ৪২) বর্ণনা করেছেন তার বিষয়বস্তু অনুসারে, ইমামদের বক্তব্য রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যায়। ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর বক্তব্য অনুসারে, ইমামগণ জ্ঞানের দিক থেকে রাসূল (সা.)-এর উত্তরাধিকারী। (কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২-২৯৩)। শেখ বাহায়ীর মত অনুযায়ী, আহলে বাইতের অনুসারীদের হাদীস বারো ইমামের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। তাঁদের নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁদের বক্তব্য রাসূল (সা.)-এর দিকে ফিরে যায় এবং আইলে বাইতের জ্ঞানের উৎপত্তি ওহীর পাত্র থেকেই। (আল-ওয়াজীয, পৃ. ২২)

এ কারণে ইমামগণ কুরআনের মাধ্যমে কুরআন তাফসীরের পদ্ধতি ব্যবহার ছাড়াও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের তাফসীরকে রাসূল (সা.) অথবা অন্যান্য ইমামের দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। মাসুম ইমামগণ অনেক আয়াতের তাফসীর রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলী (আ.) সূরা ইবরাহীমের ৫ নং আয়াত, 'তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিনগুলোর (ইয়াওমুল্লাহ্) দ্বারা উপদেশ দান কর'-এর 'আল্লাহ্‌র দিনগুলো'র তাফসীরে রাসূল (সা.)-এর হাদীসের মাধ্যেমে প্রমাণ করেছেন যে, এ দিনগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহ। (শেখ তূসী, আমালী, ১৭তম মাজলেস; আল-বুরহান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৫; বিহারুল আনওয়ার, ৬৭তম খণ্ড, পৃ. ২০)। একইভাবে আলী

(আ.) সূরা রাহমানের ৬০ নং আয়াত, 'ইহসানের পুরস্কার ইহসান ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে কি?'-এর তাফসীরে বলেছেন : 'যাকে তাওহীদের নেয়ামত দিয়েছি তার পুরস্কার জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়।' (শেখ সাদুক, তাওহীদ, পৃ. ৬; কানযুদ দাকায়েক, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৫৮৭)

ইমাম কাযিম (আ.) সূরা বাকারার ১৯৬ নং আয়াত, 'কিন্তু কেউ যদি তা (সহজলভ্য কোরবানী) না পায় তাহলে তাকে হজ্বের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফেরার পর সাত দিন– এই পূর্ণ দশ দিন রোযা রাখতে হবে'– এ আয়াতের বিষয়ে তাঁর একজন সাহাবীর করা প্রশ্নের উত্তর ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণ করেছেন (তাফসীরে আ'ইয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯; বিহারুল আনওয়ার, ৯৯তম খণ্ড, পৃ. ২৯১)।

ইমাম রেযা (আ.) সূরা বাকারার ৫৮ নং আয়াত, 'বল, গুনাহসমূহকে (আমাদের থেকে) অপসারণ কর। আমি তোমাদের ক্ষমা করব এবং খুব শীঘ্রই সৎকর্মপরায়ণদের (নেয়ামত) বৃদ্ধি করব'-এর তাফসীরে ইমাম বাকির (আ.)-এর বক্তব্য এনেছেন : 'আমরা তোমাদের গুনাহ অপসারণকারী' (তাফসীরে আ'ইয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫; বিহারুল আনওয়ার, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ১২২)।

বিষয়বস্তু সংক্রান্ত তাফসীর অথবা 'তা-ভীল' বা অভ্যন্তরীণ অর্থে তাফসীর

আহলে বাইত (আ.)-এর তাফসীরের মূল অংশ আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিক তাফসীরের অর্থ হলো বিষয়বস্তু বা ভাবার্থ সংক্রান্ত তাফসীর। এর অর্থ এ নয় যে, তাঁরা আয়াতের শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব দিতেন না; বরং এর অর্থ হলো কুরআনের বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর থাকার কারণে এর 'তাফসীর' এবং 'তা-ভীল' ভিন্নরূপে করা সম্ভব। আর এখানেই আহলে যিক্‌র (আহলে কুরআন)-এর বাস্তব উদাহরণ হিসেবে আহলে বাইতের আত্মিক এবং জ্ঞানগত উপস্থিতি অর্থবহ হয়।

এর ওপর ভিত্তি করে আহলে যিক্‌রের বাস্তব উদাহরণ হিসেবে দৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী ইমামগণ কর্তৃক বর্ণনামূলক তাফসীরের মাধ্যমে কুরআনের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যার সীমানা বৃদ্ধি লাভ করেছে। 'তা-ভীল' (অভ্যন্তরীণ অর্থে ব্যাখ্যা) শব্দটি ক্রিয়ামূল আকারে কুরআনে সাতটি সূরায় সাতবার এসেছে। যেসব আয়াতে এ শব্দটি রয়েছে তা যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে নিম্নলিখিত অর্থগুলোর যে কোন একটি হবে :

১. স্বপ্নের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

২. কোন কাজের পরিণতি

৩. আয়াতের বাতেনী (লুক্কায়িত) অর্থ উদ্ঘাটন

এ অর্থগুলো ছাড়াও 'তা-ভীল' শব্দটি রাসূলের হাদীসে এবং তাঁর সাহাবী ও উত্তরাধিকারদের কথাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। 'তা-ভীল' শব্দটি রেওয়ায়াতে সার্বিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। (বিস্তারিত জানতে : জারইয়ন শেনোসী তাফসীরে এরফানী, অত্র প্রাবন্ধিকের রচিত, পৃ. ২০-২৮)।

অন্যভাবে বলা যায়, এ রেওয়ায়াতগুলো পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'তা-ভীল' বলতে প্রত্যেক যুগের বা সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে কুরআনের অর্থ করাকে বুঝায়। ইমামদের করা কুরআনের আধ্যাত্মিক বা বিষয়বস্তু সংক্রান্ত তাফসীর এবং অভ্যন্তরীণ অর্থে তাফসীর নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে :

ক. কোন কিছুর বাস্তব উদাহরণ দেওয়া বা নির্দিষ্ট কিছুর সাথে তুলনা করা

এ পদ্ধতি অনুসারে আয়াতকে বাস্তবতার সাথে মেলানো এবং ইন্দ্রিয়গাহ্য কোন ঘটনার সাথে অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়। তুলনার মাধ্যমে আয়াতের অর্থগত ভাবার্থ সত্যিকারের রূপে প্রকাশ লাভ করে। এক্ষেত্রে ইমাম সাদিক (আ.)-এর সূরা নিসার ৫ নং আয়াত, 'তোমাদের সম্পদ– যা আল্লাহ্ তোমাদের জীবিকা নির্বাহের পথ হিসেবে দিয়েছেন– তা নির্বোধ মালিকদের দিও না'-এর প্রকৃত অর্থে ব্যাখ্যা একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এ আয়াতে ইমাম সাদিক (আ.) রাসূল (সা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী 'নির্বোধ মালিকদের'– মদপানকারী ও এরূপ বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তি অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। (মাজমাউল বায়ান, ৩য় এবং ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪)

এ ধরনের ব্যাখ্যার আরেকটি উদাহরণ আলী (আ.)-এর 'হাসানা' এবং 'সাইয়্যেআ' শব্দের ব্যাখ্যায় প্রকাশ লাভ করেছে। তিনি এ দু'টি শব্দ ধারাবাহিকভাবে সূরা নাম্‌লের ৮৯ নং আয়াত, 'যে কেউ ভাল ও সৎ (কর্ম) নিয়ে আসবে অতঃপর তার জন্য এর থেকে উত্তম (প্রতিদান) রয়েছে' এবং ৯০ নং আয়াত, 'যে কেউ খারাপ ও অসৎ (কর্ম) নিয়ে আসবে অতঃপর তাকে অধোমুখি করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।' 'হাসানা'-কে আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা এবং 'সাইয়্যেআ'-কে আহলে বাইতের প্রতি ঘৃণা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

তেমনি ইমাম সাদিক (আ.) আহলে বাইতের ইমামদেরকে সূরা নিসার ৫৪ নং আয়াতে 'যে লোকদের প্রতি হিংসা করা হয়', এর বাস্তব উদাহরণ এবং ব্যাখ্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র ইমাম বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত তাফসীরে ইমামত সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায়ও এ বিষয়ে ইশারা রয়েছে। উদাহরণসরূপ সূরা বাকারার ২০৮ নং আয়াত, 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সকলে শান্তিতে প্রবেশ কর'– এই আয়াতে 'সিল্‌ম' অর্থাৎ শান্তি বলতে আহলে বাইত এবং তাঁদের বেলায়াতকে বুঝিয়েছেন। 'সিল্‌ম' এর আরো অর্থ রয়েছে যা সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

খ. ভাবার্থের প্রসারণ করা অথবা বাস্তবতার সাথে তুলনা করা

এই পরিভাষা ইমাম বাকির (আ.)-এর নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন : 'যদি এমন হয় যে, কোন জাতির প্রতি কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ঐ জাতির মৃত্যু হয় এবং এর ফলে ঐ আয়াতেরও মৃত্যু ঘটে, তাহলে কুরআনের কোন আয়াত-ই অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু কুরআন তো যতদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে ততদিন অবশিষ্ট থাকবে। প্রত্যেক জাতির জন্য (যা তারা পাঠ করে তাতে) আয়াত বা নির্দশন রয়েছে যার সঠিক ব্যবহার অথবা অপব্যবহার রয়েছে।' (তাফসীরে আ'ইয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫)। অন্যদিকে বিশেষ কিছু রেওয়ায়াতে কুরআনের বাতেনী বা অন্তর্নিহিত অর্থকে– যা এর ভাবার্থের প্রসারণ হিসেবে গণ্য করা হয়– বাস্তবতার সাথে তুলনাকরণ বলা হয় (কুরআন দার ইসলাম, পৃ. ৫০)। এ কারণে কুরআনের ভাবার্থের প্রসারণ ঘটানো এবং একে যুগোপযোগী তাফসীর করা হল ইমামদের বিষয়বস্তুভিত্তিক তাফসীরের আরেক ধরনের পদ্ধতি।

কুরআনের সূরা কাসাসের ৭৭ নং আয়াত, 'দুনিয়া থেকে তোমার অংশ নিতে ভুল না'– যা কারুন সম্পর্কে এসেছে– এর তাফসীরে ইমাম আলী (আ.) নাসিব (অংশ) শব্দটিকে সুস্থতা, সামর্থ্য, বিশ্রাম ও তারুণ্য অর্থে প্রসারণ করেছেন। (মা'আনিউল আখবার, পৃ. ৩২৫; নূরুস সাকালাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৯)

ইমাম আলী (আ.) একইভাবে আল্লাহ্‌র সাথে নিজের জীবন লেনদেনকারীদের অর্থ প্রসারণ করেছেন। যারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতে গিয়ে শহীদ হন তাঁদের সকলকে আল্লাহ্‌র সাথে নিজের জীবন লেনদেনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (মাজমাউল বায়ান, ১ম ও ২য় খণ্ড,)

আহলে বাইতের তাফসীর, তাফসীরের পদ্ধতি শিক্ষাদানে ভূমিকাস্বরূপ

কোন কোন কুরআন গবেষকগণের মতে, আহলে বাইত কুরআন তাফসীরের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও জ্ঞানদানের ভূমিকা পালন করেছেন। আহলে বাইত কুরআনের তাফসীর এবং এ থেকে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করার বিষয়ে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁরা কুরআনের সকল আয়াত তাফসীর করার চেষ্টা করেননি। (আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসেরুন ফী সাউবিহিল কাশিব, ১ম খণ্ড, ৫৬৮)। প্রকৃতপক্ষে সাহাবী এবং ছাত্রদের মাঝে কুরআনের তাফসীরের পদ্ধতি এবং মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন (প্রাগুক্ত)। ইমামদের তাফসীর সংক্রান্ত হাদীস খুব বেশি নয়। আল্লামা তাবাতাবাঈর ভাষায় সাহাবীরা আলী (আ.) থেকে কুরআনের তাফসীর সংক্রান্ত গুটি কয়েক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাবেঈদের থেকেও এক শতের বেশি হাদীস বর্ণিত হয়নি। (আল-মিজান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪)। কিন্তু এ হাদীসগুলো তাফসীরের পদ্ধতি শিক্ষার জন্য যথেষ্ট।

এ প্রবন্ধের প্রথমাংশে আহলে বাইতের কুরআনের তাফসীরের বিশেষ কিছু মূলনীতি, যেমন কুরআনের মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর, রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনামূলক তাফসীর, কুরআনের 'তাফসীর' ও 'তা-ভীল' সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করা হয়েছে।

তাফসীরের পদ্ধতি শিক্ষাদানের ভূমিকাস্বরূপ আহলে বাইতের তাফসীরের আলোচনায় পূর্বের আলোচনা সম্পূর্ণ করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ে ইঙ্গিত করা হচ্ছে :

১. তাফসীরের ক্ষেত্রে অন্য আসমানী কিতাবের কোন সূত্র বর্ণনা অথবা তা থেকে কিছু প্রমাণ করার বিষয়ে ইমামদের থেকে বিশেষভাবে নিষেধ রয়েছে। হাম্মাদ ইবনে ঈসা ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'ইহুদীদের চার হাঁটু (দুই হাঁটু ও দুই গোড়ালি) ভাঁজ করে বসা মাকরূহ হওয়ার বিশ্বাসকে (ইমাম) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন।' (কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬১)

২. শব্দের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করা আহলে বাইতের আরেকটি তাফসীর সংক্রান্ত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সূরা আলে ইমরানের ৭৭ নং আয়াত, 'অবশ্যই যারা আল্লাহ্‌র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার ও নিজেদের শপথগুলোকে স্বল্প মূল্যে (পার্থিব লাভে) বিক্রি করে তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাদের সাথে কথাও বলবেন না, আর তাদের দিকে তাকাবেন না।'– এ সম্পর্কে আলী (আ.) থেকে আবী মাহাম্মার

সা'দীর রেওয়ায়াতটি চমৎকার! ইমাম আলী (আ.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন : 'কিয়ামতের দিন তাদেরকে কল্যাণ এবং রহমতের দৃষ্টিতে দেখা হবে না।' আরবরা যখন তাদের মধ্যে বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তিদের বলে : 'তোমাদের নিকট থেকে কোন কিছু (খবর) আমার কাছে পৌঁছে না', তখন এর অর্থ বোঝায়, 'তোমাদের মাধ্যমে আমার কোন উপকার হয় না'; এখানে এই আয়াতেও একই ধরনের অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে কল্যাণ এবং রহমত পাঠাবেন না। আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন না। (তাফসীরে আ'ইয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫)

সূরা ফাত্হ এর ৪৮ নং আয়াত, 'আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের ওপরে'-ইমাম বাকির (আ.) এ আয়াতে 'হাত'-এর তাফসীরে বলেছেন : 'আরবি ভাষায় হাত হলো শক্তি এবং নেয়ামত।' (তাওহীদে সাদুক, পৃ. ১০৪)

অন্যদিকে আহলে বাইত কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে জাহেলি যুগের কবিতার ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকতেন; এমনকি ইমাম আলী (আ.) জাহেলি যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, ইমরুল কাইসকে 'পথভ্রষ্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এ রকম অবস্থায় কিভাবে পথভ্রষ্টদের থেকে বর্ণনা কুরআনী দলিল হতে পারে? (নাহজুল বালাগা, সংক্ষিপ্ত বাণী, ৪৫৫)

৩. ইমামগণ কুরআনের বাক্যের বর্ণনা-নীতি ও প্রকাশভঙ্গি অনুযায়ী তাফসীর করতেন। আলী ইবনে ইবরাহীম কুম্মী সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াত, 'রং তো কেবল আল্লাহ্রই রং, আর আল্লাহ্ অপেক্ষা উত্তম রং কার হবে? এবং আমরা তো কেবল তাঁরই উপাসনাকারী'-এর তাফসীরে ইমাম সাদিক (আ.) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, 'রং' বলতে এখানে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আল্লামা তাবাতাবাঈ তাঁর তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : 'এই বাক্যের বর্ণনা-নীতি ও প্রকাশভঙ্গি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের অনুসারীদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বানের প্রতি ইঙ্গিত করে।' (আল-মিযান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫; সাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯)

৪. ইমামগণ কুরআনের মাধ্যমে কুরআন তাফসীর করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল ব্যবহার করতেন। কুরআনের আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা করা স্বয়ং কুরআনের শিক্ষা। ইমামগণ এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কোন কোন আয়াতের তাফসীরে ইমামদের বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ইমাম বাকির (আ.)-এর মাধ্যমে ওযুর আয়াত (মায়িদা : ৬) ও সফরে কসরের নামায সংক্রান্ত আয়াত (নিসা : ১০১-১০২) এবং ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর মাধ্যমে হাত কাটার আয়াত (মায়িদা : ৩৮) এবং ইমাম কাযিম (আ.)-এর মাধ্যমে মদ পান নিষেধ সংক্রান্ত আয়াত (বাকারা : ২১৯) এবং অন্যান্য আরো বেশ কিছু আয়াতের বুদ্ধিবৃত্তিক তাফসীর উল্লেখযোগ্য। এগুলো এটাই নির্দেশ করে যে, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আয়াত সম্পর্কে গভীর চিন্তার আলোকে যে সূক্ষ্ম বিষয়সমূহকে কুরআনের তাফসীর করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকে আদর্শ ও নমুনা হিসেবে তাফসীরে ব্যবহার করা সম্ভব। (কাফী, কুলাইনী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০; আল-মিনার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৬-২২৭; মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৮ এবং ২৭৯, হাদীস নং ১২৬৬)

অনুবাদ : মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

সূত্র

১. ইবনে আবী জুমহুর এহসায়ী : আওয়ালীউল লায়ালী, তাহকীক মারাশী ওয়া মুজতাবাবী ইরাকী, কোম, ১৪০৪ হিজরি।

২. ইবনে আ'তীয়ে আন্দালুসী : আল-মুহাররারুল ওয়াজীজ ফী তাফসীরুল কিতাবুল আযীয, বিজো, ১৩৯৫ হিজরি।

৩. ইবনে কাতীবে : আল-মাআ'রেফ, দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৭ হিজরি।

৪. ইবনে নাদীম : আল-ফিহ্‌রিস্ত, তরজমা মুহাম্মদ রেযা তাজাদ্দোদ, আমীর কাবীর, তেহরান, ১৩৬৬ সংখ্যা।

৫. আহমাদ ইবনে হাম্বাল : মুসনাদ, ইস্তাম্বুল, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ।

৬. ইসফাহানী , আবু নাঈম : হুলইয়াতুল আউলিয়া, দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪০৯ হিজরি।

৭. বাহরানী, সাইয়্যেদ হাশেমী : আল-বুরহান ফী তাফসীরুল কুরআন, মুয়াসসিসাতুল ইসমাঈলীয়ন, কোম।

৮. বাহায়ী, বাহাউদ্দীন : আল-ওয়াজীয, লিথো ছাপা, শহীদ ছানীর দেরায়া সংযুক্তি সহকারে।

৯. তিরমিযী, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা : সুনানুত তিরমিযী, ইস্তাম্বুল, ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ।

১০. তাফসীরুল ফুরাতুল কুফী, গবেষণা ও পর্যালোচনায় মুহাম্মাদ কাযেম (মাহমুদ), তেহরান।

১১. ইমাম হাসান আসকারী (আ.)-এর সাথে সম্পর্কিত তাফসীর, মানশুরাতে ইমাম মাহদী, কোম, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

১২. হাকিম হাসকানী, ওবাইদ ইবনে আহমাদ : শাওয়াহেদুত তানযীল লী কাওয়ায়িদিত তাফসীর, গবেষণায় মুহাম্মদ বাকির মাহমুদী, তেহরান, ১৪১১ হিজরি।

১৩. হাকিম নিশাবুরী, আবু আবদান : আল-মুসতাদরাকু আ'লাস সাহিহাইন, বৈরুত, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত ।

১৪. হুররে আ'মেলী, মুহাম্মাদ, ইবনে হাসান : ওসায়েলুশ শিয়া ইলা তাহসীলুস শারয়ীয়া, গবেষণায় রাব্বানী সিরাজী, বৈরুত।

১৫. হাকিম, মুহাম্মাদ বাকির : উলুমুল কুরআন, মাজমায়ে ইল্‌মী ইসলামী, তেহরান, ১৪০৩ হিজরি।

১৬. খাতীব বাগদাদী, আল-কেফায়া ফী ইল্‌মীর রেওয়ায়া, গবেষণায় আহমাদ উমার হাশীম, বৈরুত, ১৪০৬ হিজরি।

১৭. যাহাবী, মুহাম্মাদ হোসেইন : আত-তাফসীর ওয়াল মুফাস্‌সিরুন, প্রকাশের স্থান অজ্ঞাত, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত ।

১৮. সুলাইম ইবনে কাইসে হেলালী : আসরারে আলে-মুহাম্মাদ, অনুবাদক ইসমাঈল আনসারী, কোম, ১৩৭৫ ইরানী সৌরবর্ষ।

১৯. শুশতারী, কাজী নূরুদ্দীন : ইহকাকুল হাক্ব, গবেষণায় আয়াতুল্লাহ মারশী নাজাফী, কোম।

২০. সাদুক, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে বাবেওয়াই : তাওহীদ, সাইয়্যেদ হাসান খোরাসানীর ভূমিকায়, নাজাফ, ১৩৮৬ হিজরি।

২১. সাদুক, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে বাবেওয়াই : মাআ'নিউল আখবার, আলী আকবার গাফফারী কর্তৃক সংশোধিত, কোম, ১৩৬১ ইরানী সৌরবর্ষ।

২২. সাদুক, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে বাবেওয়াই : মান লা ইয়াহদুরুহুল ফাকীহ, বৈরুত, ১৪০১ হিজরি।

২৩. সাদুক, মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে বাবেওয়াই : খিসাল, আলী আকবার গাফফারী কর্তৃক সংশোধিত, কোম, ১৪০৩ হিজরি।

২৪. সাগীর, মুহাম্মাদ হোসাইন : আল-মাবাদিউল 'আম্মা লিত-তাফসীর, কোম, ১৪১৩ হিজরি।

২৫. সাফার, মুহাম্মাদ ইবনে হোসাইন : বাসায়েরুদ দারাজাত, মানশুরোতে আ'লামী, তেহরান, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

২৬. তাবাতাবাঈ, মুহাম্মাদ হোসাইন : আল-মীযান ফী তাফসীরিল কুরআন, মুয়াসসেসাতুল আ'লামী, বৈরুত, ১৩৯৩ হিজরি।

২৭. তাবাতাবাঈ, মুহাম্মাদ হোসাইন : কুরআন দার ইসলাম, কোম, ১৩৬১ ইরানী বর্ষ।

২৮. তাবারসী, আবু মানসূর, আহমাদ ইবনে আলী : ইহতিজাজ, সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বাকিরের গবেষণায়, নাজাফ, ১৩৮৬ হিজরি।

২৯. তাবারসী, ফাদল ইবনে হাসান : মাজমাউল বায়ান, হাশিম রাসূলী মাহাল্লাতী, ইয়াজদী তাবাতাবাঈ, বৈরুত, ১৪০৮ হিজরি।

৩০. তাবারী, মুহাম্মাদ বিন জারীর : জামেউল বায়ান আন তাবীলি আইল কুরআন, মাহমুদ মুহাম্মাদ শাকিরের গবেষণায়, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, দারুল মাআ'রেফ, মিশর।

৩১. তূসী, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান : আমালী, সাইয়্যেদ মুসাভী খোরাসানীর গবেষণায়, কোম, ১৪১৪ হিজরি।

৩২. তাইয়্যেব, আবদুল হোসাইন : আতইয়াবুল বায়ান ফী তাফসীরুল কুরআন, তেহরান, ১৩৯৩ হিজরি।

৩৩. রেযা, আবদুর রাশীদ: তাফসীরুল মিনার, বৈরুত, আফসাত, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত।

৩৪. 'আরুসীয়ে হুয়াইযী, আবদে আলী : নূরুস সাকালাইন, সাইয়্যেদ হাশিম রাসূলী মাহাল্লাতী, আফসাম, কোম।

৩৫. 'আক, আব্দুর রাহমান : উসুলুত তাফসীর ওয়া কাওয়ায়েদুহু, দারুল নাফায়েস, বৈরুত, ১৪০৬ হিজরি।

৩৬. 'আইয়াশী সামার কান্দী, মুহাম্মাদ ইবনে মাসউদ : আত-তাফসীর, তাহকীক, কিসমুদ দেরাসাতুল ইসলামীয়া, কোম, ১৪২১ হিজরি।

৩৭. গায্যালী, আবু হামেদ : ইহইয়াউ উলুমুদ দ্বীন, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, বিতো।

৩৮. ফেইজ কাশানী, মুহাম্মদ ইবনে মুরতাজা : আস্‌সাফী ফী তাফসীরুল কুরআন, গবেষণায় মোহসেন হোসাইনী আমিনী, তেহরান, ১৪১৯ হিজরি।

৩৯. কাসিম পুর, মোহসেন : যারিয়ন সেনোসী তাফসীরে ইরফানী, ইনতিশারাতে সামীন, তেহরান, ১৩৮১ ইরানী বর্ষ।

৪০. কুরতুবী, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ, জামেউ লি আহকামুল কুরআন, গবেষণায় মুহাম্মাদ আবদুল কাদির আতা, বৈরুত, ১৪০৮ হিজরি।

৪১. কুলাইনী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব : আল-কাফী, গবেষণায় আলী আকবার গাফ্‌ফারী, তেহরান, ১৩৮৮ হিজরি।

৪২. কুলাইনী, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব : আল-কাফী, অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় জাওয়াদ মুসতাফাবী, তেহরান, দাফতারে নাশরে ফারহাঙ্গে আহলে বাইত, বিতো।

৪৩. মাজলেসী, মুহাম্মাদ বাকির : বিহারুল আনওয়ার, ইনতিশারাতুল ওফা, বৈরুত, ১৪০৪ হিজরি।

৪৪. মোহসেন আমীন : আ'ইয়ানুশ শিয়া, দারুল তাআ'রেফ, বৈরুত, ১৩৮০ হিজরি।

৪৫. মাশহাদী, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদরেজা কুম্মী : কানযুল দাকায়েক ওয়া বাহরুল গারায়েব, গবেষণায় হোসাইন দারগহী, ওযারাতে এরশাদ, ১৪১১ হিজরি।

৪৬. মা'রেফাত, মুহাম্মাদ হাদী : আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসেরুন ফী ছাউবাতিল কাশিব, মাশহাদ, ১৪১৮-১৪১৯ হিজরি।

৪৭. মুফীদ, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ : আমালী, গবেষণায় আলী আকবার গাফ্ফারী, কোম, ১৪০৩ হিজরি।

(প্রবন্ধটি ইরান থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন কাবাসাত, ২৯তম সংখ্যা, ১৩৮২ ফারসি সাল থেকে নেয়া হয়েছে।)

হাদীসে সাকালাইন ও এর সাথে সাংঘর্ষিক বলে দাবি করা হাদীসসমূহের পর্যালোচনা

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

ভূমিকা

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি : আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার বংশধর (ইতরাত), আমার আহলে বাইত; নিশ্চয়ই এ দু'টি কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না হাউসের নিকট (হাউসে কাউসারের নিকট) আমার কাছে উপস্থিত হয় (কিয়ামত দিবসে)।' নাসায়ী, আহমাদ, খাসায়িস, পৃ. ১১২, হাদীস ৭৮; ইবনে মাগাযিলী, মানাকিব, পৃ. ২৩০, হাদীস ২৮৩; আবু ইয়ালী, মুসনাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৭, হাদীস ১০২১; ইবনে আবি আসিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৬৩০, হাদীস ১৫৫৫; ইবনে হাম্বাল, মুসনাদ, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২১১, হাদীস ১১১৩১; তাবারানী, সুলাইমান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৯, হাদীস ৯৮০ ও ৪৯৮১।

মহানবী (সা.) বলেন : 'নিশ্চয়ই আমি দু'টি মূল্যবান ও ভারী বস্তু তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধর কখনও বিভ্রান্ত হবে না, (তা হল) আল্লাহ্র কিতাব ও আমার বংশধর, নিকটাত্মীয় এবং এ দু'টি আমার সঙ্গে হাউজে কাউসারে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।'*[১]

---

*সুন্নি সূত্রসমূহের মধ্যে দ্রষ্টব্য : সুনানে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬২২, হাদীস নং ৩৭৮৬ ও পৃ. ৬৬৩, হাদীস নং ৩৭৮৮; হাকিম নিশাবুরী, মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ ও ১১০; ইবনে আসিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৬২৯, হাদীস ১৫৫৩ এবং পৃ. ৬৩০, হাদীস ১৫৫৮; ইবনে হাম্বাল, মুসনাদ, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৬১, হাদীস ১১১০৪; তাবারানী, সুলাইমান, আল মোজামুল কাবির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৫-৬৭, হাদীস ২৬৭৮, ২৬৮০ ও ২৬৮১ এবং ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬, হাদীস ৪৯৭১; ইবনে হামিদ, মুসনাদ, পৃ. ১০৭-১০৮, হাদীস ২৪০; 'কিতাবুল্লাহ ওয়া আহলুল বাইত ফি হাদীসিস সাকালাইন মিন মাসাদিরি আহলিস সুন্নাহ' গ্রন্থে এই হাদীসটির সূত্রসমূহ মোটামুটিভাবে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ হাদীসটি 'হাদীসে সাকালাইন' বা দু'টি মূল্যবান জিনিসের হাদীস নামে প্রসিদ্ধ। এ হাদীসের অনুসরণ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে গত চৌদ্দ শতাব্দী যাবৎ মুসলমানদের ওপর চরম বিপর্যয় নেমে আসে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে।

যদি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সাথে জনগণ কর্তৃক মেনে চলা জনপ্রিয় বিধিবিধান ও মূল্যবোধসমূহের তুলনা করা হয় তাহলে যে কারও কাছেই কুরআনের সাথে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। নিশ্চিতভাবেই কুরআনের বাণী ও চেতনার সাথে মুসলিম সমাজ কর্তৃক মেনে চলা বিধানের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে; বিগত কয়েক শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া এবং মুসলিম দেশগুলোর শাসন কর্তৃত্ব অত্যাচারীদের হাতে চলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে ব্যবধান কখনই এতটা ব্যাপক ছিল না।

কারও কাছে মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইতের বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট হয়ে যাবে যখন তারা ইতিহাসে অধ্যয়ন করবে যে, কীভাবে বনু উমাইয়্যা ও বনু আব্বাসের সময় মহানবীর পরিবারের ইমামগণকে জনগণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল! এর ফলে পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যাদাতা এবং এর সংরক্ষকদের–মহানবী (সা.)-এর ভাষ্যমতে যাঁদেরকে সময়ের স্রোত কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না–চরম নযরদারির মধ্যে রাখা হতো, তাঁদেরকে নির্বাসনে পাঠানো হতো, বন্দি করা হতো, বিষ প্রয়োগে ও অন্যান্যভাবে হত্যা করা হতো। আর মানুষকে তাঁদের দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করা হতো।

শিয়া সূত্র সমূহের মধ্যে দেখুন : সাদুক, মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন নি'মাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪, ২২ তম অধ্যায়, হাদীস ৪৪-৬২; মাহমুদী, মুহাম্মাদ জাওয়াদ, তারতীবুল আমালী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮, হাদীস ১২১০ এবং পৃ. ১৬০-১৬২, হাদীস ১২১৩-১৩১৫ প্রভৃতি।

যায়দী মাজহাবের গ্রন্থসমূহের মধ্যে দ্রষ্টব্য : ইবনে শাজারী, আল আমালী খাসিসিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫; কুফী, মুহাম্মাদ ইবনে সুলাইমান, মানাকিব, পৃ. ১১২, হাদীস ৬১৬ এবং পৃ. ১৩৫, হাদীস ৬৩৩, পৃ. ১৭০, হাদীস ৬৬৩, পৃ. ৩১৩, হাদীস ৭৯৯, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬, হাদীস ৯২৮-৯২৯ এবং পৃ. ৪৪৯-৪৫০, হাদীস ৯৪৮-৯৪৯। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থে হাদীসে সাকালাইন বিভিন্ন উৎস থেকে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে আল বাহরানী, সাইয়েদ হাশেম, আল বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯-১৫; রাজী, শেখ হুসাইন, হাওয়ামেশুত তাহকীকাহ (আল মুরাজায়াতের সঙ্গে সংযুক্ত সূত্র বিষয়ক গবেষণার অংশ), পৃ. ৩২৭, তুশতারী কাজী নুরুল্লাহ্, ইহকাকুল হাক, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩০৯-৩৭৭; হিন্দী, মীর হামিদ হুসাইন, আবাকাতুল আনওয়ার, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭-৩২৮ এবং ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০-৩৯২।

আহলে বাইতকে কোণঠাসা করার মাধ্যমে অত্যাচারী শাসকরা কুরআনকে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার এবং নিজেদের অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থাকে জায়েয করার হাতিয়ারে পরিণত করে। যে কুরআন নাযিল হয়েছিল মানুষের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সমুন্নত এবং পৃথিবীতে ঐশী ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তা থেকে অত্যাচারী শাসকরা ইসলামকে একটি অবর্ণনীয় বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেয়।

বর্তমানে আমেরিকা লক্ষ-কোটি ডলার দিয়ে প্রকৃত ইসলামের বিরুদ্ধে যেভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এ কাজটিই অত্যাচারী উমাইয়্যা ও আব্বাসী শাসকরা তাদের সময়ে করেছিল। তারা ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যাকারীদের সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল এবং ইসলামের অন্য একটি রূপ প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তারা যত চেষ্টাই করুক না কেন, আহলে বাইত সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উক্তিকে মুছে ফেলতে পারেনি এবং কুরআনের সাথে আহলে বাইতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের হাদীস ও অন্যান্য হাদীস গোপন করতে পারেনি।

বিগত চৌদ্দ শতাব্দী ধরে প্রতিটি যুগে অসংখ্য সুন্নী ও শিয়া হাদীস বিশারদ ও পণ্ডিত কর্তৃক এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রতিটি যুগে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং ইসলামের ইতিহাসের অনেক বড় ও নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এটি উল্লেখ করা খুবই প্রয়োজনীয় যে, হাদীসে সাকালাইন একটি মুতাওয়াতির হাদীস। সুন্নী উৎসসমূহের মধ্যে সিহাহ সিত্তাহসহ অন্যান্য গ্রন্থে এটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে শব্দগত কিছু পার্থক্যসহ বিভিন্ন উপলক্ষে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি মানুষের জন্য একটি নিশ্চিত প্রমাণ, বিশেষ করে মাজহাব নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য। আর প্রত্যেক মুসলমানকে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ সম্পর্কে কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাওয়াতুরের অর্থ

আমরা জানি যে, মহানবী (সা.)-এর হাদীসসমূহ হাদীসের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা (সনদ) বজায় রেখে। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ

হাদীসের সনদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই এবং হাদীসের বিষয়বস্তুর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বিভিন্ন শর্ত নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা হাদীসের বৈশিষ্ট্য, এর বর্ণনাকারীদের শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়া এবং অন্যান্য কারণের ওপর নির্ভর করে এ বিষয়ে বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করেছেন। যেমন মুতাওয়াতির, খবরে ওয়াহেদ, সহীহ, হাসান, কাভী, যাইফ ইত্যাদি।

তাওয়াতুর অর্থ হল কোন একটি তথ্যের ক্ষেত্রে উৎসের প্রাচুর্য বা সংখ্যাধিক্য– যা কোন শ্রোতাকে সেই তথ্যের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করে। দূরবর্তী কোন দেশ বা শহর এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যেমন সাইরাস বা নেপোলিয়ান এর অস্তিত্ব সম্পর্কিত কারও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, এসব জ্ঞান তাওয়াতুর বর্ণনার ওপর ভিত্তিশীল। এভাবেই সমসাময়িক কোন বিষয়ের জ্ঞানও এ পর্যায়ভুক্ত যদি কোন ব্যক্তি তা নাও দেখে থাকে।

একটি মুতাওয়াতির হাদীস হল সেটিই যা অনেকগুলো ধারায় বর্ণিত হয়েছে এবং প্রতি যুগে এসব বর্ণনাকারীর কোনভাবেই একত্র হয়ে কোন হাদীস জাল করার ক্ষেত্রে সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। যদিও কতিপয় হাদীসশাস্ত্রবিদ বর্ণনাকারীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করেছেন, যেমন পাঁচ, সাত অথবা দশ, কিন্তু সাধারণভাবে এ ক্ষেত্রে কোন সংখ্যাকে নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বর্ণনাকারীর যে সংখ্যা শ্রোতার কাছে নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তা নির্ভর করে শ্রোতার অভিজ্ঞতার ওপর।

ইসলামী আইনশাস্ত্র কোন হাদীসের মুতাওয়াতির হওয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করেছে। আল-গাযযালী তাঁর 'আল-মুসতাসফা মিন ইল্‌ম আল-উসূল গ্রন্থে নিম্নলিখিত শর্ত উল্লেখ করেছেন যার কয়েকটি হল :

১. রাবী তাঁর জ্ঞানের (ইল্‌ম) ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করবেন এবং তাঁর ধারণার (যান্ন) ওপর নির্ভর করবেন না।

২. তাঁদের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত হবে হবে।

৩. বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এ পরিমাণ হতে হবে যাতে নিশ্চয়তা অর্জিত হয়।

৪. হাদীস বর্ণনার ধারাবাহিকতায় সকল ক্ষেত্রে প্রথম দু'টি শর্ত পূরণ করতে হবে এবং প্রতি পর্যায়ে বর্ণনাকারীদের সংখ্যার ক্ষেত্রে তৃতীয় শর্তটি পূরণ করতে হবে।

'মাআলিম আল-উসূল' গ্রন্থের প্রণেতা শিয়া পণ্ডিত আশ-শাইখ আল-হাসান ইবনে যাইন আল-দীন তাওয়াতুরের ক্ষেত্রে একই ধরনের শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত প্রয়োজন হয় না অথবা তাঁদের বিশ্বস্ত হওয়ারও প্রয়োজন নেই যখন তাওয়াতুরের শর্ত পূরণ হয়ে যায়; বরং আল- গায্যালী সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, এমন ক্ষেত্রে এমনকি ফাসেক বর্ণনাকারীর নিকট থেকেও জ্ঞান অর্জিত হয়। 'মাআলিম' এর প্রণেতা মুতাওয়াতির বর্ণনার জন্য দু'টি শর্ত উল্লেখ করেছেন :

১. শ্রোতার এ ব্যাপারে পূর্বে কোন জ্ঞান থাকবে না। কারণ, এটি সম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি কোন একটি বিষয় জানে সে একই বিষয় আবারও জানবে।

২. শ্রোতা তার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনরূপ সন্দেহ বা আনুগত্য দ্বারা বাধাগ্রস্ত হবে না; তাহলে সেই তথ্য তার ওপর প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হবে।

কিছু সংখ্যক সহীহ বর্ণনা

হাদীসে সাকালাইন একটি মুতাওয়াতির হাদীস যা কেবল সুন্নী উৎসসমূহেই অনেক সূত্রে মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা যদি এর সাথে তাওয়াতুরভাবে আহলে বাইতের সূত্রের বর্ণনাগুলো যোগ করি তাহলে এর মোট বর্ণনাকারীর সংখ্যা একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হয়ে যাবে।

হাদীসটি বেশ কয়েকটি সহীহ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ এসব বর্ণনার ধারাবাহিকতায় বর্ণনাকারীরা সকলেই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) বলে গণ্য। এসবের মধ্য থেকে মুসলিম ও হাকিম নিশাবুরী কর্তৃক সংকলিত চারটি সহীহ সূত্র নিচে উল্লেখ করা হল :

(মুসলিম বলেন :) যুহাইর ইবনে হার্‌ব এবং সূজা ইবনে মাখলাদ আমার কাছে উলাইয়াহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (যুহাইর বলেন), ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম আমাদের কাছে বর্ণনা করেন আবু হাইয়্যান থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনে হাইয়্যান থেকে যে, 'হুসাইন ইবনে সাবরাহ্, উমার ইবনে মুসলিম এবং আমি যায়েদ ইবনে আরকামকে দেখতে গিয়েছিলাম। যখন আমরা তাঁর নিকট বসলাম তখন হুসাইন

তাঁকে বললেন, 'হে যায়েদ! আপনি তো অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-কে দেখেছেন, তাঁর কথা শুনেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সাথে থেকে লড়াই করেছেন এবং তাঁর পেছনে নামায পড়েছেন। নিশ্চয়ই, হে যায়েদ! আপনি অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন তা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।'

যায়েদ বললেন : 'হে আমার ভাতিজা! আল্লাহ্‌র কসম। আমি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে গেছি, আমার আয়ুষ্কাল অনেক হয়েছে। তাই কিছু কিছু কথা যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে শুনে মনে রেখেছিলাম, তা ভুলে গেছি। সুতরাং আমি তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করি তা সাদরে গ্রহণ কর এবং আমি যা বর্ণনা করি না তার জন্য আমাকে বাধ্য কর না।' অতঃপর তিনি বললেন : 'একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা ও মদীনার মাঝখানে অবস্থিত 'খুম' নামক জলাশয়ের নিকট আমাদের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং উপদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন : হে লোকসকল! আমি তো মানুষই। অচিরেই আমার প্রভুর তরফ থেকে দূত এসে যাবে, আর আমি তাঁর ডাকে (মৃত্যুর আহ্বানে) সাড়া দিব। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (মূল্যবান) বস্তু (সাকালাইন) রেখে যাচ্ছি। (এ দু'টির) প্রথমটি হলো আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) যা হেদায়াত ও নূরে পরিপূর্ণ। অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে ধারণ কর এবং মজবুত করে আঁকড়ে ধর। তারপর তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে (আমাদের) উদ্বুদ্ধ করলেন ও উৎসাহ প্রদান করলেন। অতঃপর বললেন : আর (দ্বিতীয়ত) আমার আহলে বাইত (পরিবার)। আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার আহলে বাইত সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।...'

[সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, ফাযায়েলে সাহাবা অধ্যায় (মাকতাবাত ওয়া মাতবা'আত–মুহাম্মাদ আলী সুবাইহ ওয়া আউলাদুহু : কায়রো), পৃ. ১২২-১২৩]

একই সূত্রে আহমাদ ইবনে হাম্বাল হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটিও সহীহ সূত্রে বর্ণিত এ কারণে যে, বর্ণনাকারীরা সকলেই মুসলিমেরও বর্ণনাকারী। (মুসনাদে আহমাদ, ৩২তম খণ্ড, পৃ.৫৬, হাদীস ১৯২৬৬)

আলবানী তাঁর সহীহ সুনানুত তিরমিজীর গবেষণা গ্রন্থের টীকা (৩য় খণ্ড, পৃ.৪৭৬ ও ৫৪৩), সিলসিলাতুল আহাদিসুস সাহিহা (৪র্থ খণ্ড, পৃ.৩৫৬-৩৫৭) ও সাহিহু আল জামেয়ুস সাগীর (১ম খণ্ড, পৃ.৪৮২) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। শুয়াইব 'আরনাউত সুনানুত তিরমিযী' (৬ষ্ঠ খণ্ড, প্র.২৩৭) ও 'মুশুকিলুল আসার' (তাহাভী রচিত) গ্রন্থের শারহে (৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮-১৯) এবং কাসতালানী তাঁর 'আল মাতালিবুল আলীয়া' গ্রন্থেও (১৬তম খণ্ড, পৃ.১৪২) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

(হাকিম বলেন :) বাগদাদে আমাদের কাছে আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে তামিম আল-হানযালী বর্ণনা করেন, তিনি আবু কাল্লাবাহ আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মাদ আল রাক্কাশী থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে হাম্মাদ থেকে; আমার কাছে আরও বর্ণনা করেছেন আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে বালাওয়াইহ এবং আবু বকর আহমাদ ইবনে জাফর আল-বাযযায, তাঁরা উভয়েই আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বাল থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে হাম্মাদ থেকে; এবং আমাদের কাছে আরও বর্ণনা করেছেন বুখারার ফকীহ আবু নাসর আহমাদ ইবনে সুহাইল থেকে, তিনি সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ থেকে যিনি বাগদাদের হাফিয, তিনি খালাফ ইবনে সালিম আল-মাখরামী থেকে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে হাম্মাদ থেকে; এবং ইয়াহইয়া ইবনে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন আবু উয়াইনাহ থেকে, তিনি সুলাইমান আল-আমাশ থেকে, তিনি হাবিব ইবনে আবি সাবিত থেকে, তিনি আবু আল-তুফাইল থেকে, তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে, যিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তাঁর বিদায় হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন গাদীরে খুমে অবতরণ করলেন এবং গাছগুলোর নিচে সমবেত হওয়ার আদেশ দিলেন। সেগুলোর নিচে পরিষ্কার করা হল। তারপর তিনি বললেন : 'আমি (মৃত্যুর) আহ্বানে সাড়া দিতে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান জিনিস রেখে গেলাম, যার একটি অপরটি অপেক্ষা বৃহৎ। মহান আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার ইতরাত (আহলে বাইত)। তাই লক্ষ্য রেখ, আমার পরে এ দুয়ের সাথে তোমরা কেমন আচরণ কর; নিশ্চয়ই হাউসে আমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত তারা একে অপর থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না।' তারপর তিনি বলেন : 'নিশ্চয়ই সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ আমার অভিভাবক (মাওলা) এবং আমি প্রত্যেক মুমিনের অভিভাবক।' তারপর তিনি আলী (রা.)-এর হাত ধরলেন এবং বললেন : 'আমি যার অভিভাবক, এ (আলী) তার

অভিভাবক। হে আল্লাহ্! যে তাকে ভালবাসে, তুমি তাকে ভালবাস এবং যে তার সাথে শত্রুতা করে তুমি তার শত্রু হও।'

(হাকিম আরও যুক্ত করেন :) 'এ হাদীসটি শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম) কর্তৃক সহীহ হওয়ার শর্তের ভিত্তিতে সহীহ, যদিও তাঁরা এ হাদীসটি পুরোপুরি বর্ণনা করেননি।'

(হাকিম বলেন :) প্রথম হাদীসটি (উপরোল্লিখিত) নিচের হাদীস দ্বারা সমর্থিত যা বর্ণিত হয়েছে সালামাহ ইবনে কুহাইল থেকে, তিন আবু আল-তুফাইল থেকে। আর এটিও বুখারী ও মুসলিমের দৃষ্টিকোণ থেকে সহীহ। আমাদের কাছে আবু বকর ইবনে ইসহাক এবং দালায ইবনে আহমাদ ইবনে সিজ্জী বর্ণনা করেন, তাঁরা উভয়েই মুহাম্মাদ ইবনে আইউব থেকে, তিনি আল-আযরাক ইবনে আলী থেকে, তিনি হাসান ইবনে ইবরাহীম আল-কিরমানী থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ ইবনে কুহাইল থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু আল-তুফাইল থেকে, তিনি ইবনে ওয়াসিলা থেকে, যিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.)-কে বলতে শুনেছেন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা ও মদীনার মধ্যে পাঁচটি গাছঘেরা ছায়াময় একটি স্থানে অবতরণ করেন। লোকেরা গাছের নিচে পরিষ্কার করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সন্ধ্যার নামায আদায় করেন। নামাযের পর তিনি লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করেন, উপদেশ দেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে যা বলতে আদেশ করেছেন তা বলেন। তারপর তিনি বলেন : 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান বিষয় (আমরাইন) রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা সে দু'টিকে অনুসরণ কর, তোমরা কখনই বিপথগামী হবে না। এ দু'টি হলো : আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার আহলে বাইত, আমার ইতরাত।' তারপর তিনি তিনবার বলেন : 'তোমরা কি জান যে, মুমিনদের নিজেদের অপেক্ষা আমি তাদের ওপর অধিক অধিকার রাখি?' জনগণ বলে : 'হ্যাঁ।' তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : 'আমি যার অভিভাবক, আলীও তার অভিভাবক।'

[আল-ইমাম আল-হাফিয আবু আবদুল্লাহ্ আল-হাকিম আন-নিশাবুরি, আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন (দারুল মারিফাহ লি আল-তিবাহ ওয়া আন-নাশ্র, বৈরুত), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১০]

(আল-হাকিম বলেন :) আমাদের কাছে রাইয়ের ফকীহ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আল-মুগীরাহ আল-সাদী থেকে, তিনি জারীর ইবনে আবদুল হামিদ থেকে, তিনি আল-হাসান ইবনে আবদুল্লাহ্ আন-নাখায়ী থেকে, তিনি মুসলিম ইবনে সুবাইহ থেকে, তিনি যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) থেকে, যিনি বলেন : 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে দু'টি মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি : আল্লাহ্র কিতাব এবং আমার আহলে বাইত। নিশ্চয়ই এ দু'টি আমার কাছে হাউসের পাশে ফিরে আসা পর্যন্ত কখনই বিচ্ছিন্ন হবে না।'

(আল-হাকিম বলেন :) 'এ হাদীসটি শাইখাইনের (বুখারী ও মুসলিমের) সনদ গ্রহণের শর্তে সহীহ, যদিও তাঁরা এটি লিপিবদ্ধ করেননি।' (আল-হাকিম, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮)

এগুলো হলো যায়েদ ইবনে আরকাম কর্তৃক চারটি পৃথক সূত্রে বর্ণিত হাদীস। তাঁদের নির্ভরযোগ্যতা হাদীসশাস্ত্রের দু'জন বিখ্যাত ইমাম কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে।

হাদীসে সাকালাইন

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিটি যুগে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী ও নেতৃস্থানীয় আলেম হাদীসে সাকালাইন বর্ণনা করেছেন। এগুলো বিভিন্ন তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আমরা এখানে সেখান থেকে কয়েকটি মাত্র তুলে ধরব। তার মধ্যে সাহাবী বর্ণনাকারীদের বিষয়টি বিশদভাবে তুলে ধরা হলো।

সাহাবী বর্ণনাকারী

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে ত্রিশেরও অধিক সাহাবী হাদীসে সাকালাইন বর্ণনা করেছেন। তাঁদের নামের পাশাপাশি যেসব লেখক তাঁদের গ্রন্থে হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিচে দেওয়া হল :

১. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) (শাহাদাত ৪০ হি./ ৬৬১ খ্রি.)

ক. আবু বকর আহমাদ ইবনে আবদুল খালিক আল-বাযযায

খ. আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর আত-তাবারী

গ. শাম্‌স আল-দীন আল-শাখাভী

ঘ. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতি

ঙ. নুরুল দীন আশ-শামহুদী

চ. আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী

ছ. আহমাদ ইবনে আল ফাযল ইবনে মুহাম্মাদ বা কাসীর আল-মাক্কী

জ. সুলায়মান ইবনে ইবরাহীম আল-কুন্দুজী

২. ইমাম হাসান ইবনে আলী (৩-৫০ হি./ ৬২৪-৬৭০ খ্রি.)

ক. আল-কুন্দুজী

৩. সালমান আল-ফারসি (মৃ. ৩৬ হি./ ৬৫৬ খ্রি.)

ক. আল কুন্দুজী

৪. জুন্দাব ইবনে জুনাদাহ, আবু যার আল-গিফারী (মৃ. ৩২ হি./ ৬৫০ খ্রি.)

ক. মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী

খ. ইবনে উকদাহ

গ. ইবনে কাসীর

ঘ. সাখাভী

ঙ. সামহুদী

৫. আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (৩ হিজরি-পূর্ব-৬৮/ ৬১৯-৬৮৭ খ্রি.)

ক. সুলায়মান ইবনে ইবরাহীম আল-কুন্দুজী

৬. সা'দ ইবনে মালিক, আবু সাইদ আল-খুদরী (১০ হিজরি-পূর্ব-৭৪/ ৬১৩-৬৯৩ খ্রি.)

ক. মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আল-মাদানী

খ. আবদুর রহমান আল-মাসউদী

গ. ইবনে সা'দ আল-যুহরী

ঘ. আহমাদ ইবনে হাম্বাল

ঙ. আবু জাফর আত-তাবারী

চ. আবুল কাসিম আল-তাবারানী

ছ. আবু তাহির আল-যাহাবী

ঞ. ইবনে আবদুল বার

ট. ফাখ্‌র আল-দীন রাযী

ঠ. ইবনে কাসীর আল-দিমাশকী

ঢ. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতি

ণ. শিহাব আল-দীন আল-কাসতালানী

ত. আলী আল-কারী আল-হিন্দী

থ. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বাকী আল-যারকানী

দ. সুলায়মান ইবনে ইবরাহীম আল-কুন্দুজী এবং অন্যান্য

৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (১৬ হিজরি-পূর্ব-৭৮/ ৬০৭-৬৯৭ খ্রি.)

ক. আল-তিরমিযী

খ. আন-নাসায়ী

গ. আল-খাতীব আল-বাগদাদী

ঘ. আবু বকর আল-বাগাভী

ঙ. ইবনে কাসীর দামিশকী

চ. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতি

ছ. নুরুল দীন আল-সামহুদী

জ. আলী আল-কারী আল-হিন্দী

ঝ. আল-মির্যা হাসান আলী মুহাদ্দিস আল-লাখনাভী

ঞ. আল-শাইখ সুলায়মান আল-কুন্দুজী

ট. আল-সিদ্দীক হাসান খান আল-কনৌওযী

৮. আবু হাইসাম মালিক ইবনে তাইহান (মৃ. ২০ হি./ ৬৪১ খ্রি.)

ক. শাম্‌স আল-দীন আশ-শাওকানী

খ. নুরু আল-দীন আশ শামহুদী

গ. সুলায়মান আল-কুন্দুজী

৯. ইবরাহীম আবু রাফে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম খাদেম (মৃ. ৪০ হি./ ৬৬১ খ্রি.)

ক. ইবনে উকদাহ

খ. আল শাওকানী

গ. আল শামহুদী

ঘ. আল কুন্দুজী

১০. হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (মৃ. ৩৬ হি./ ৬৫৬ খ্রি.)

ক. শেখ সুলায়মান ইবনে ইবরাহীম আল কুন্দুজী

১১. হুযায়ফাহ ইবনে উসাইদ আল গিফারী

ক. আবু ঈসা আল তিরমিযী

খ. আল হাকিম

গ. আবুল কাসিম তাবারানী

ঘ. আবু নাঈম ইসফাহানী

ঙ. আবুল কাসিম ইবনে আসির

চ. ইবনে কাসির দামিশকী

ছ. শাম্‌স আল দীন শাখাভী

১২. খুযায়মা ইবনে সাবিত যু শাহাদাতাইন (মৃ. ৩৭ হি./ ৬৫৭ খ্রি.)

ক. আবুল আব্বাস আল উকদা

খ. শাম্‌স আল দীন আল সাখাভী

গ. নূর আল দীন আল সামহুদী

ঘ. আহমাদ ইবনে ফযল ইবনে বা কাসির

ঙ. আল শেখ সুলায়মান আল কুন্দুজী

১৩. যায়েদ ইবনে সাবিত (মৃ. ৪৫ হি./ ৬৬৫ খ্রি.)

ক. মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক

খ. আহমাদ ইবনে হাম্বল

গ. আবু জাফর তাবারী

ঘ. আবুল কাসিম আত তাবারানী

ঙ. আবু আবদুল্লাহ আল গাঞ্জী শাফেয়ী

চ. জালালুদ্দীন সুয়ূতী

ছ. আলী আল কারী আল হিন্দী

জ. সুলায়মান ইবনে ইবরাহীম আল কুন্দুজী

১৪. আবু হুরায়রা, আবদুর রহমান ইবনে সাখ্‌র (মৃ. ৫৯ হি./ ৬৭৯ খ্রি.)

ক. আবু বকর আল বায্‌যায

খ. শাম্‌স আল দীন আল সাখাভী

গ. জালালুদ্দীন সুয়ূতী

ঘ. নূরুদ্দীন আল সামহুদী

১৫. আবদুল্লাহ ইবনে হান্‌তাব

ক. আবুল কাসিম তাবারানী

খ. আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আসির

গ. জালালুদ্দীন সুয়ূতী

১৬. যুবায়ের ইবনে মুতঈম (মৃ. ৫৯ হি./ ৬৭৯ খ্রি.)

ক. আবু নাঈম ইসফাহানী

খ. শেখ সুলায়মান আল কুন্দুজী

১৭. বাররা ইবনে আযীব (মৃ. ৭১ হি./ ৬৯০ খ্রি.)

ক. আবু নাঈম ইসফাহানী

১৮. আনাস ইবনে মালিক (মৃ. ৯৩ হি./ ৭১২ খ্রি.)

ক. আবু নুয়াইম আল ইসফাহানী

১৯. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত তায়মী (মৃ. ৩৬ হি./ ৬৫৬ খ্রি.)

ক. শেখ সুলায়মান আল কুন্দুজী

২০. আবদুর রহমান ইবনে আউফ (মৃ. ৩২ হি./ ৬৫২ খ্রি.)

ক. আল কুন্দুজী

২১. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (মৃ. ৫৫ হি./ ৬৭৫ খ্রি.)

ক. আল কুন্দুজী

২২. আম্‌র ইবনুল আস (মৃ. ৫০ হি./ ৬৬৪)

ক. আল মুওয়াফ্‌ফাক ইবনে আহমাদ আল খারাযমী

২৩. সাহল ইবনে সা'দ আল আনসারী (মৃ. ৯১ হি./ ৭১০ খ্রি.)

খ. শাম্‌স আল দীন আস সাখাভী

গ. নূরুদ্দীন আস সামহুদী

ঘ. সুলায়মান কুন্দুজী

২৪. আদী ইবনে হাতেম (মৃ. ৬৮ হি./ ৬৮৭ খ্রি.)

২৫. উকবাহ ইবনে আমীর (মৃ. ৫৮ হি./ ৬৭৮ খ্রি.)

২৬. আবু আইউব আনসারী, খালিদ ইবনে যায়েদ (মৃ. ৫২ হি./ ৬৭২ খ্রি.)

২৭. আবু সুরাইহ আল খুযায়ী, খুওয়াইলিদ ইবনে আম্‌র (মৃ. ৬৮ হি./ ৬৮৭ খ্রি.)

২৮. আবু কুদামাহ, আল আনসারী (শহীদ ৩৭ হি./ খ্রি. ৬৫৭)

২৯. আবু লায়লা আল আনসারী (শহীদ ৩৭ হি./ খ্রি. ৬৫৭ খ্রি.)

৩০. উমায়রাহ আল আসলামী

(২৪-৩০ নং পর্যন্ত সাহাবীদের বর্ণনা নিচের গ্রন্থাবলীতে এসেছে)

ক. ইবনে উকদা

খ. আল সাখাভী

গ. আল সামহুদী

ঘ. আল কুন্দুজী

৩১. আম্‌র ইবনে লায়লা ইবনে দামরাহ

ক. ইবনে হাজার আল আসকালানী

খ. শাম্‌স আল দনি আল সাখাভী

গ. নূর আল দীন আল সামহুদী

ঘ. আল কুন্দুজী

৩২. যায়েদ ইবনে আরকাম (মৃ. ৬৮ হি./ ৬৮৭ খ্রি.)

ক. আন নাসাঈ

খ. আল হাকিম

গ. আল তাবারানী

ঘ. আলী আল মুত্তাকী আল হিন্দী

ঙ. আল সামহুদী

৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (মৃ. ৭৩ হি./ ৬৯২ খ্রি.)

৩৪. ফাতিমা যাহরা (আ.) (শাহাদাত ১১ হি./ ৬৩২ খ্রি.)

ক. শেখ সুলায়মান আল কুন্দুজী

৩৫. উম্মে সালামাহ, হিন্দ বিনতে সুহাইল (মৃ. ৬২ হি./ ৬৮১ খ্রি.)

ক. ইবনে উকদাহ

খ. আবুল হাসান আলী ইবনে উমর আল দারেকুতনী

গ. আস সাখাভী

ঘ. আস সামহুদী

৩৬. উম্মে হানী, ফাখতাব বিনতে আবি তালিব (মৃ. ৪০ হি./ ৬৬১ খ্রি.)

ক. ইবনে উকদাহ

খ. আস সাখাভী

গ. আস সামহুদী

তাবেয়ী বর্ণনাকারী

বিপুল সংখ্যক তাবেয়ী উপরিউক্ত সাহাবীদের একজন অথবা বহুজনের নিকট থেকে শুনে হাদীসে সাকালাইন বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকজনের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো :

৩৭. আবু তুফাইল আমীর ইবনে ওয়াসিলাহ আল লাইসী (মৃ. ১০০ হি./ ৭১৮ খ্রি.)

৩৮. আতিয়াহ ইবনে সা'দ আল আউফি

৪১. হাবিব ইবনে আবি সাবিত

৪২. আলী ইবনে রাবিআ

৪৩. আল কাসিম ইবনে হাসান

৪৬. ইয়াহইয়া ইবনে যুদাহ

৪৮. আল আসবাগ ইবনে নুবাতাহ

৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাফি

৫১. আবদুর রহমান ইবনে আবি সাঈদ আল খুদরী

৫৪. আল হাসান ইবনে হাসান ইবনে আবি তালিব

৫৫. যায়নুল আবেদীন, আলী ইবনুল হুসাইন (আ.)

৫৬. ইয়াযীদ ইবনে হাইয়্যান

হাদীসে সাকালাইনের অর্থ

অনেক হাদীস থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, গাদীরে খুমে একটি ভাষণের মধ্যেই মহানবী (সা.) হাদীসে সাকালাইন ও হাদীসে গাদীরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এসব হাদীসের কয়েকটি মুত্তাকী আল-হিন্দী তাঁর 'কানজুল উম্মাল' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭), ইবনে কাসির তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে (৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯), আস সাখাভী তাঁর 'আল-ইসতিজলাব' গ্রন্থে, আল সামহুদী তাঁর 'জাওয়াহির আল ইকদাইন' গ্রন্থে এবং ইবনে হাজার তাঁর 'সাওয়ায়েক' গ্রন্থে তাবারানী ও অন্যদের থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কতিপয় হাদীসে 'খালিফাতাইন' (উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি) শব্দটি সাকালাইন শব্দের পরিবর্তে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন আহমাদ ইবনে হাম্বাল তাঁর মুসনাদে (৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮১) উল্লেখ করেছেন। আবার তাবারানী, ইবনে আবি আসিম, আবু বকর

ইবনে আবি শায়বাহ, আল-যারকানী এবং অন্যরাও উল্লেখ করেছেন। এই শব্দ ইমাম আলী (আ.) এবং আহলে বাইতের নেতৃত্ব ও খেলাফতের বিষয়টিকে সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশ করে।

এ হাদীসের কতিপয় বর্ণনা, যেমন কুন্দুজী তাঁর ইয়া নাবি আল-মাওয়াদ্দাহতে হাসান ইবনে আলী (আ.) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে নবী (সা.)-এর বাণী রয়েছে যা ইমামতের চিরস্থায়িত্বের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করেছে :

'হে আল্লাহ্! তুমি দুনিয়াকে সৃষ্টির ওপর তোমার হুজ্জাত থেকে খালি রেখ না যাতে তোমার হুজ্জাত বাতিল হয়ে যায় অথবা তুমি তাদের পথনির্দেশ দেওয়ার পর তোমার বন্ধুরা বিপথে যেতে না পারে। তারা (আল্লাহ্র হুজ্জাত) সংখ্যায় অল্প, কিন্তু সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্র নৈকট্যশীল। নিশ্চয়ই আমি প্রশংসিত ও মহান আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেছিলাম পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমার বংশধরদের মধ্যে এবং আমার বংশধরদের বংশধরদের মধ্যে এবং আমার বীজের মধ্যে এবং আমার বীজের বীজের মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দেওয়ার। আর আমার প্রার্থনা কবুল হয়েছে।'

এটি নাহজুল বালাগায় বর্ণিত (হিকাম : ১৪৭) আলী (আ.) কর্তৃক তাঁর শিষ্য কুমাইল ইবনে যিয়াদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ :

...হ্যাঁ, পৃথিবী কখনও এমন লোকশূন্য হয়ে যায় না যারা গোপনে বা প্রকাশ্যে আল্লাহর ওপর রক্ষা করে এবং তারা সব সময় শংকিত থাকে যে, আল্লাহর গুপ্ত ওজর ও প্রমাণ যেন অপ্রমাণিত না হয়। তাদের সংখ্যা কত, আর তারা কোথায়? আল্লাহর কসম, তাদের সংখ্যা কম, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট তাদের সম্মান অনেক বেশি। তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর ওজর ও প্রমাণ রক্ষা করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের মতো অপর কাউকে বিশ্বাস না করে এবং তাদের মতো অন্য কারও হৃদয়ে আস্থার বীজ বপন না করে।

জ্ঞান তাদেরকে সত্যিকার বোধগম্যতার দিকে চালিত করে এবং এ কারণে তারা দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন আত্মার সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। অন্যেরা যেটাকে কঠিন বলে মনে করে তা তারা সহজ বলে মনে করে। অজ্ঞরা যা বিস্ময়কর মনে করে, তারা তা সাদরে গ্রহণ করে। তারা এ পৃথিবীতে দেহ নিয়ে বসবাস করে, কিন্তু তাদের আত্মা

অনেক উর্ধ্বে অবস্থান করে। আল্লাহর জমিনে তারা আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তাঁর দীনের প্রতি আহ্বানকারী। আহা! তাদেরকে দেখার জন্য আমার আকুল আগ্রহ!

হযরত আলীর এ বক্তব্য অনেক হাদীসবেত্তা ও ঐতিহাসিক তাঁদের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখ করেছেন। যেমন ইবনে আব্দ রাব্বিহ তাঁর 'আল ইকদুল ফারীদ' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫, ২৯৩); ইয়াকুবী তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০); আল হাররানী তাঁর 'তুহাফুল উকূল' গ্রন্থে (পৃ. ১৬৯); আল খাতীব আল বাগদাদী তাঁর 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯); আল রাযী তাঁর 'তাফসীরে কাবীর' গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২); ইবনে আবদুল বার তাঁর 'আল মুখতাসার' গ্রন্থে (পৃ. ২৯) এ রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।

হাদীসে সাকালাইনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে হওয়া কতিপয় হাদীস

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ আবদুল আযীয দেহলভী একটি গ্রন্থে (তোহফায়ে ইসনা আশারা) হাদীসে সাকালাইনের সাথে সাংঘর্ষিক কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করে হাদীসে সাকালাইনের ঘোষিত আহলে বাইতের নেতৃত্বের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। আমরা এখানে সেই হাদীসগুলো উল্লেখ করে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করব।

প্রথম হাদীস

শাহ আবদুল আযীয তাঁর তুহ্ফা গ্রন্থে বলেন, যদি হাদীসে সাকালাইন গ্রহণ করা হয়েও থাকে, তবু তা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অপর কয়েকটি হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এসব হাদীসের মধ্য থেকে তিনি নিম্নোল্লিখিত হাদীসটিকে সহীহ বলে দাবি করেন :

'আমার সুন্নাহ অনুসরণ কর এবং আমার পর সঠিক পথপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারীদের (খোলাফায়ে রাশেদীনের) অনুসরণ কর, তা আঁকড়ে ধর এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক।'

সাইয়্যেদ হামিদ হুসাইন (আবাকাত আল আনওয়ার গ্রন্থের প্রণেতা) বলেন যে, এমন হাদীস সহীহ নয়।

প্রথমত, তিনি বলেন, এ হাদীসটি কেবল সুন্নীদের দ্বারা বর্ণনাকৃত। অন্যদিকে হাদীসে সাকালাইন সুন্নীদের পাশাপাশি আহলে বাইতের মাযহাবের আলেমগণও বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত শাহ আবদুল আযীয এখানে তাঁর স্বঘোষিত নীতি ওপর বহাল থাকেননি যে, আহলে বাইতের মতবাদের বিপক্ষে তাঁর যুক্তি তাদের দ্বারা গ্রহণীয় লেখনীর ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

তৃতীয়ত হাদীসটি মুসলিম ও বুখারী লিপিবদ্ধ করেননি– হাদীসের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত যাঁদেরকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মনে করে থাকে।

চতুর্থত, উপরিউক্ত হাদীসের সহীহ হওয়ার দাবিটি মিথ্যা। কারণ, সুন্নী আলেমগণের দ্বারাই এ হাদীসের সনদকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

এ হাদীসের ওপর পর্যালোচনা

এ হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আবু দাউদের রাবীদের সম্পর্কিত আলোচনা :

আল-আরবাদ ইবনে সারিআহ– তিনি এ হাদীসের অন্যতম রাবী (বর্ণনাকারী)। তিনি নির্ভরযোগ্য নন। কারণ, তিনি নিজের সম্বন্ধেই এমন উক্তি করেছেন যে, 'আমি ইসলামের এক-চতুর্থাংশ।'

হাজার ইবনে হাজার আল কিলাই– সিরিয়ার একটি শহরে বসবাস করত যে শহরের অধিবাসীরা আলী (আ.)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করত। ইবনে হাজার তাঁর তাহযীব আত তাহযীবে তাঁর অবস্থা অজ্ঞাত বলে উল্লেখ করেছেন। (৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৮)

খালিদ ইবনে মাদান ইবনে আবি কারিব আল কিতাবী– সে ছিল ইসলামের ইতিহাসের কুখ্যাত শাসক ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার পুলিশ বাহিনীর প্রধান।

সাওর ইবনে ইয়াযীদ– ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন যে, সে আলী (আ.)-কে ঘৃণা করত। কারণ, তিনি এক যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যা করেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতেন এবং তাঁকে একজন গোঁড়া মনে করতেন।

পরবর্তী রাবী হলো **আল ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম**। আবু মুসহার কর্তৃক জালকরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যা মিযানুল ইতিদালে যাহাবী উল্লেখ করেছেন (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৪৭) ।

অন্যদিকে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ যেসব রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেমন আবু আসিম, হাসান ইবনে আলী আল-খাল্লাল, বুহাইর ইবনে সা'দ, বাকীয়াহ ইবনে আল-ওয়ালীদ, ইয়াহইয়া ইবনে আবি আল-মুতী, আবদুল্লাহ্ ইবনে আলা', মু'আবিয়া ইবনে সালিহ, ইসমাঈল ইবনে বিশ্‌র ইবনে মানসূর এবং আবুল মালিক ইবনে আল-সাব্বাহ– তাঁরা সকলেই দুর্বল রাবী। আহলে সুন্নাতের রেজালশাস্ত্রবিদগণ তাঁদের সকলকেই দুর্বল রাবী হিসাবে অভিহিত করেছেন।

উপরন্তু যদি এ হাদীসটি সহীহ বলে ধরেও নিই, তবু তা হাদীসে সাকালাইনের বিপক্ষে কোন গুরুত্ব রাখে না। কারণ, হাদীসে সাকালাইন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিপুল সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে সুন্নী পণ্ডিতদের বিপুল সংখ্যক তাঁদের হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেননি। যদি এ হাদীসটি সত্যিই নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে, তবে 'সঠিক পথপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারী' শব্দগুলো আহলে বাইতের বারো ইমামের ওপর আরোপ করা যায়– যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আরেকটি প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হতে পারে। আর সেই হাদীসটি হল 'আমার পরে বারো জন খলীফা বা ইমাম আসবে।'

শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক উত্থাপিত আরেকটি প্রশ্নের জবাব দান

আবদুল আযীয বলেছেন, যদি হাদীসে সাকালাইন পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নাও হয়, তবুও 'ইতরাত' শব্দ সাধারণভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর গোত্র বনি হাশিমের সকল আত্মীয় অথবা হযরত ফাতিমার সকল বংশধরের ওপর আরোপ করা যায়। তাহলে এটি বলা অবান্তর যে, তাঁদের সকলেই হলেন ইমাম।

সাইয়্যেদ হামিদ হুসাইন এ সন্দেহ সম্পর্কে নানা অভিধান রচয়িতার অর্থ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন জাওহারী, ইবনে আসির, ইবনে মানযুর, আল ফিরূযাবাদী এবং অন্যরা। তাঁদের মতে 'ইতরাত' বলতে বুঝায় কারও নিকটতম আত্মীয় (আখাস আকরাবীন), সন্তানাদি (ওয়ালাদ) এবং বংশধর (যুররিয়াহ্)।

উপরন্তু তিনি উল্লেখ করেন, হাদীসে সাকালাইন তাঁদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাধান্যের পাশাপাশি তাঁদের পাপ ও ভুল থেকে মুক্ত থাকার বিষয়টিও নির্দেশ করে। এমন বর্ণনা নিঃসন্দেহে কেবল বারো ইমামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, আলী (আ.) যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'ইতরাত' বলে পরিচিত করিয়েছেন এবং কুরআনের ব্যাপারে তাঁদেরকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় হাদীস

শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক উত্থাপিত দ্বিতীয় হাদীসটি হলো :

'ধর্মের বিষয়াদি তোমরা এই হুমায়রার (আয়েশা) নিকট থেকে গ্রহণ কর।'

তিনি এ হাদীসটিকে সহীহ বলে দাবি করেছেন।

সাইয়্যেদ হামিদ হুসাইন বলেন যে, সুন্নী পণ্ডিতগণই এ হাদীসকে জাল ও বানোয়াট বলে গণ্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

১. আল-মিযযী এবং যাহাবী (আল-তাকরীর ওয়াল তাহবীর ফি শার্হ আল-তাহরীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯)।

২. ইবনুল কাইয়্যেম জাওযীয়াহ, যেসব হাদীস 'হে হুমায়রা' এবং 'আল-হুমায়রা' শব্দযোগে এসেছে সেসব হাদীসকে তিনি জাল বলে গণ্য করেছেন।

৩. ইবনে কাসির, (আল-দুরুর আল-মুনতাশিরাহ ফি আল-আহাদীস আল-মুশতাহিরাহ্, পৃ. ৭৯)।

৪. ইবনে হাজার আল-আসকালানী, (আল-তাকরীর ওয়া আল-তাহবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯)।

৫. তাঁদের পাশাপাশি ইবনুল মুলাক্কিন, আস সুবকি, ইবনে আমির আল-হাজ, আল-সাখাভী, আল-সুয়ূতী, আল-শায়বানী, আল-শেখ আলী আল-কারী, আল-যারকানী, আবদুল আলী আল-শাওকানী এবং অন্যরাও এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তৃতীয় হাদীস

শাহ আবদুল আযীয আরেকটি হাদীসকে হাদীসে সাকালাইনের সাথে সাংঘর্ষিক হিসাবে এনেছেন। আর তা হলো :

'আম্মারের নিকট থেকে পথনির্দেশনা চাও।'

সাইয়্যেদ হামিদ হুসাইন বলেন যে, এমন হাদীস কখনই হাদীসে সাকালাইনের বিপরীতে উত্থাপন করা যায় না। কারণ, হযরত আম্মার নিজেই হযরত আলী (আ.)-এর একনিষ্ঠ শিয়া (অনুসারী) ছিলেন এবং মহানবী (সা.) তাঁকে হযরত আলীকে মেনে চলা ও তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এভাবে :

'হে আম্মার! আলী তোমাকে সত্যপথ হতে বিচ্যুত করবে না। হে আম্মার! আলীর আনুগত্য আমার আনুগত্য, আর আমার আনুগত্যই হল সর্বশক্তিমান ও প্রশংসিত আল্লাহ্‌র আনুগত্য।'

এ হাদীসটি বেশ কয়েকটি সুন্নী হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ফারায়েদুস সিমতাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮; আল মাওয়াদ্দাহ্ ফিল কুরবা; আল খারাযমীর মানাকিব, পৃ. ৫৭ ও ১২৪; ইয়া নাবি আল-মাওয়াদ্দাহ, পৃ. ১২৮ ও ২৫০; মিফতাহ্ আন-নাযা এবং কানজুল উম্মাল, ১২তম খণ্ড, পৃ. ২১২।

উপরন্তু এ বিষয়টি অদ্ভুত যে, শাহ আবদুল আযীয এ হাদীসকে হাদীসে সাকালাইনের বিপরীতে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে ঐতিহাসিক ইয়াকুবী তাঁর তারিখে (২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪) এবং মাসউদী তাঁর মুরুযুয যাহাব (২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪২) গ্রন্থে আম্মারকে তাঁদের মধ্যে গণ্য করেছেন যাঁরা প্রথম খলীফার আনুগত্য করা থেকে দূরে ছিলেন। হযরত উমর তাঁর খেলাফতকালে আম্মারের দিকনির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং কর্কশ কণ্ঠে তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন যখন তিনি ওযূর জন্য পানি না পেলে নামায

ছেড়ে না দিয়ে তায়াম্মুম করার মাধ্যমে পবিত্র হবার বিষয়টি তাঁর কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। এ ঘটনাটি নিম্নের হাদীস গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে : মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৫; সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১০; আবু দাউদ, নাসাঈ, তাবারী, আল-আঈনী, ইবনে আসির এবং আল-শায়বানীও এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

হযরত উসমান তাঁর খেলাফতকালে আম্মারকে ততক্ষণ প্রহার করেন যতক্ষণ না আম্মার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন এবং মারা যাওয়ার উপক্রম হয়। এ ঘটনাটি তখন ঘটে যখন তিনি হযরত উসমানের শাসনামলের বিভিন্ন অনিয়ম সম্পর্কে মুসলমানদের প্রতিবাদলিপি তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। এ ঘটনাটি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে : ইবনে কুতাইবার আল-ইমামাহ্ ওয়াল সিয়াসাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২; ইবনে আবদ রাব্বিহের আল-ইকদুল ফারীদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২; মাসউদীর মুরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; ইবনে আবদুল বারের আল-ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬; ইয়াকুবীর তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০।

যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আম্মার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছিলেন, যেমন 'আম্মারের শত্রু আল্লাহ্র শত্রু', তারপরও রাসূলের কতিপয় সাহাবী কর্তৃক তিনি প্রতিরোধের মুখে পড়েন, তাঁরা তাঁকে ঘৃণা করতেন এবং তাঁর সাথে খারাপ আচরণ করতেন, যেমন আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, মুগীরাহ ইবনে শোবা, আবু মূসা আশআরী, আবু মাসউদ আল-আনসারী এবং অন্যরা। আম্মার দৃঢ়ভাবে আলীর পক্ষে এবং আলীর বিরোধিতাকারীদের বিপক্ষে দাঁড়ান। যেমন তিনি তালহা, যুবায়েরের বিপক্ষে জামাল যুদ্ধে এবং মু'আবিয়ার বিপক্ষে সিফ্ফীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পরিশেষে তিনি মু'আবিয়ার সৈন্যদের দ্বারা নিহত হন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষদ্বাণীর সত্যতা প্রকাশিত হয় যে, 'আম্মার একদল বিদ্রোহী (আল-ফিআত আল-বাগিয়াহ) কর্তৃক নিহত হবে।'

চতুর্থ হাদীস

সাইয়্যেদ হামিদ হুসাইন আরও কয়েকটি হাদীসের ওপর আলোচনা করেন যা আবদুল আযীয কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছে। যেমন :

'ইবনে উম্মে আব্‌দ (আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ) এর সিদ্ধান্তের ওপর কর্ম সম্পাদন কর।' অথবা 'ইবনে উম্মে আব্‌দ এর অভিমতই তোমাদের জন্য আমার অভিমত।'

এ দু'টি হাদীসই দুর্বল (যাইফ) এবং খবরে আহাদ, যেখানে হাদীসে সাকালাইন হলো মুতাওয়াতির। মুসলিম ও বুখারী উভয়েই যেহেতু এটি তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেননি, তাই বলা যায় তাঁরা এগুলোর সনদকে দুর্বল মনে করেছেন।

উপরন্তু যদি এগুলো সত্য বলে ধরে নেয়া হয় তুবও সেগুলো হাদীসে সাকালাইনের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, এগুলো কেবল ইবনে মাসউদের প্রতিভাকে বর্ণনা করে, অন্যদিকে হাদীসে সাকালাইন আহলে বাইতের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁদের নেতৃত্বের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে।

উপরন্তু শাহ আবদুল আযীযের ক্ষেত্রে এখানে দ্বিমুখিতা লক্ষ্যণীয় যে, তিনি এ হাদীসগুলোকে উপস্থাপন করেছেন, অথচ ইবনে মাসউদের কর্মকাণ্ডকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিবর্তে হযরত উমর তাঁকে ফতোয়া দিতে নিষেধ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন এবং তাঁর মদীনা ত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। এ অবস্থা হযরত উমরের ইন্তেকাল পর্যন্ত বহাল ছিল। হযরত উসমান আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ইবনে মাসউদকে এতটা নির্দয়ভাবে প্রহার করেছিলেন যে, তাঁর পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল।

পঞ্চম হাদীস

শাহ আবদুল আযীয আরেকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন :

'মু'আয ইবনে জাবাল হারাম ও হালাল সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী।'

সাইয়্যেদ হামিদ হুসাইন বলেন যে, এটি কেবল সুন্নীদের দ্বারাই বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারী এ হাদীসকে পরিহার করেছেন। সুন্নী পণ্ডিতদের মধ্যে ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনে আবদুল হাদী, যাহাবী, মানাভী প্রমুখ এ হাদীসকে দুর্বল মনে করেছেন বা ভিত্তিহীন বলেছেন।

এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আল-বাইলামানী, তাঁর পিতা, যায়েদ আল-আম্মি, সালিম ইবনে সালিম হাদীস ও রিযালশাস্ত্রের আলেমগণ

কর্তৃক অবিশ্বস্ত বলে বিবেচিত হয়েছেন। যেমন : বুখারী, নাসাঈ, আল-মাকদিসী, দারে কুতনী, ইবনে হাজার, আল-যাহাবী, ইবনুল জাওযী এবং অন্যরা অবিশ্বস্ত বলেছেন।

উপরন্তু তাবাকাতে ইবনে সা'দ (৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৫) এবং ইবনে আবদুল বারের আল-ইস্তিআবে (৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪০৪) এমন কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যাতে বোঝা যায় যে, উপরিউক্ত হাদীসে তাঁর জন্য যে যোগ্যতা দাবি করা হয় তিনি সে রকম যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না।

ষষ্ঠ হাদীস

শাহ আবদুল আযীয রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি হাদীস এনেছেন যেটার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রাধিকারের দাবি করেছেন যা তাওয়াতুরের কাছাকাছি :

'আমার পরে যারা আসবে তাদের অনুসরণ কর, আবু বকর ও উমর।'

হামিদ হুসাইন বলেন, শুরার দাবি সমর্থনযোগ্য নয় এবং অনেক সুন্নী আলেম এ হাদীসের ত্রুটি পেয়েছেন এবং একে ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন। যেমন : আবু হাতিম আল-রাযী, আল-বাযযায এবং ইবনে হায্ম (ফাত্হ আল-কাদির ফি শার্হ আল-জামি আস-সাগীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২); তিরমিযী, (সহীহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৭২); উকাইলী, (আদ-দুআফা); নাক্কাস, (মিযানুল ইতিদাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪২); দারে কুতনী, (লিসান আল মিযানে, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭); ইবরী আল-ফারগানী, (শার্হ আল মিনহাজ); যাহাবী, (মিযানুল ইতিদাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫); ইবনে হাজার আল-আসকালানী, (লিসানুল মিযান, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮ ও ২৭২, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭); এবং শায়খুল ইসলাম আল-হারাভী, (আল-দুররুন নাদিদ, পৃ. ৯৭)

ইবরাহীম ইবনে ইসমাঈল, ইসমাঈল ইবনে ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবনে সালামাহ্ ইবনে কুহাইল এবং আবু আল-জারা– যাঁরা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাঁদেরকে আবু যুরাহ, আবু হাতিম, ইবনে নুমাইর, দারে কুতনী, বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মুঈন, ইবনে হিব্বান, তিরমিযী এবং অন্য অনেকেই অবিশ্বস্ত বলে গণ্য করেছেন।

উপরিউক্ত হাদীসগুলো শাহ আবদুল আযীয উত্থাপন করেছেন এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে, যদি হাদীসে সাকালাইনকে আহলে বাইতের ইমামদের ইমামতের নির্দেশক হিসাবে গণ্য করা হয় তবে এসব হাদীসও হুমায়রা, আম্মার, ইবনে মাসউদ, মুয়াজ ইবনে জাবাল, হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরের ইমামতের বিষয়টি নির্দেশ করছে। সাইয়্যেদ হামিদ হুসাইন বলেন যে, এমন উপসংহারে আমরা তখনই পৌঁছব যখন উপস্থাপিত হাদীসগুলো নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু আবাকাতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, এ হাদীসগুলো দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য যেগুলো কোনভাবেই হাদীসে সাকালাইনের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারে না– যা মুতাওয়াতির হাদীস এবং শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক রাবী ও পণ্ডিত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তম হাদীস

শাহ আবদুল আযীয তাঁর যুক্তির সপক্ষে মহানবী (সা.)-এর আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা 'হাদীসে নুজুম' নামে পরিচিত। হাদীসটি হলো :

'নিশ্চয়ই আমার সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্রতুল্য (নুজুম); তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে, তুমি সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আমার সাহাবীদের মধ্যে মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমত।'

সুন্নী আলেমদের মধ্যে যাঁরা এ হাদীসকে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন তাঁরা হলেন :

১. আহমাদ ইবনে হাম্বাল (আল-তাকরীর ওয়া আত-তাহবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯):

২. আল-মিযযী (আল-জামী বায়ান আল-ইল্‌ম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৯-৯০);

৩. আল-বাযযায (জামী বায়ান আল-ইল্‌ম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০);

৪. ইবনে আল কাত্‌তান, (আল-কামিল);

৫. দারে কুতনী (লিসান আল-মিযান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭);

৬. ইবনে হায্‌ম, (বাহার আল-মুহিত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২৮);

৭. আল-বায়হাকী, আল-হাফিয আল-ইরাকী (তাখরীয আহাদীস আল-মিনহাজ);

৮. ইবনে আবদুল বার (জামী বায়ান আল-ইল্‌ম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০-৯১);

৯. ইবনে আসাকির (ফায়যুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬);

১০. ইবনুল জাওযী, (আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়াহ ফি আল-আহাদীস আল-ওয়াহিয়াহ্‌);

১১. ইবনে দাহিয়াহ্‌ (তালিক তাখরীয আহাদীস আল-মিনহাজ);

১২. আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী (আল-দুর আল-লাকিত মিন আল-বাহ্‌র আল-মুহিত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২৭-৫২৮);

১৩. আল-যাহাবী (মিযানুল ইতিদাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২ ও ৬০৫);

১৪. ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওযীয়াহ্‌ (ইলাম আল-মুকিন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩)

১৫. যাইন আল-দীন আল-ইরাকী (তাখরীয আহাদীস আল-মিনহাজ);

১৬. ইবনে হাজার আল-আসকালানী (তালখীস আল-খাবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯১)

১৭. ইবনে আল-হুমাম (আল-তাহরীর ওয়া আত-তাহরীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯);

১৮. ইবনে আমীর আল-হাজ (আল-তাকরীর ওয়া আত-তাহরীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯);

১৯. আল-সাখাভী (আল-মাকাসিদ আল-হাসানাহ্‌, পৃ. ২৬-২৭);

২০. ইবনে আবি শারীফ (ফায়যুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬);

২১. আল-সুয়ূতী (ইতমাম আল-দিরায়াহ্‌ এবং আল-জামি আস-সাগীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬);

২২. আল-মুত্তাকী আল-হিন্দী (কানজুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৩৩);

২৩. আল-কারী (আল-মিরকাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২৩);

২৪. আল-মানাভী (আল-তাইসির ফি শার্হ আল-জামি আস-সাগীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮ এবং ফায়যুল কাদীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৬);

২৫. আল-কাফাযী [নাসীম আর রিয়াদ (আশ শিফার ব্যাখ্যাগ্রন্থ), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৩-৩২৪];

২৬. আল-সিন্দী (দিরাসাত আল-লাবিব ফি আল-উসওয়াত আল-হাসানাহ্ আল-হাবীব, পৃ. ২৪০);

২৭. আল-কাযী মুহিব্বুল্লাহ্ আল-বিহারী (মুসাল্লিম আল-সুবুত বি শার্হ আবদুল আলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০);

২৮. নিযাম আল-দীন সাহালাভী [আল-সুবহ আল-সাদিক (মানার এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ)];

২৯. আল-মাওলাভী আবদুল আলী [ফাওয়াতিহ আর-রাহমাত (শার্হ মুসাল্লিম আস-সুবুত), ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১০];

৩০. আল-শাওকানী (ইরশাদ আল-ফুহুল, পৃ. ৮৩);

৩১. ওয়ালিউল্লাহ্ ইবনে হাবীবুল্লাহ্ আল-লাখনাভী (শার্হ মুসাল্লিম আস-সুবুত);

৩২. সিদ্দীক হাসান খান আল-কনৌজী (হুসুল আল-মামুল, পৃ. ৫৬৮)।

৩৩. নাসির উদ্দিন আলবানী (যঈফ ও মওযু হাদীস)

নিম্নলিখিত কারণেও এ হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য :

১. হাদীসটি কেবল এটিই ইঙ্গিত করে না যে, প্রত্যেক সাহাবীই ন্যায়নিষ্ঠ; বরং প্রত্যেকেই উম্মতের যোগ্য নেতা ও পথপ্রদর্শক। এটি সর্বসম্মতভাবে মিথ্যা। কারণ, তাঁরা নিজেরাই পথনির্দেশনার মুখাপেক্ষী ছিলেন।

২. ইতিহাসের বর্ণনা মতে তাঁদের একটি দল বিভিন্ন গুরুতর পাপের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। যেমন হত্যাকাণ্ড এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান ইত্যাদি। আর তাই এটি যুক্তিসংগত নয় যে, মহানবী (সা.) এমন ব্যক্তিদের উম্মাহ্র পথনির্দেশক ও নেতা মনোনীত করবেন।

৩. পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে, বিশেষ করে সূরা বাকারা, সূরা আহযাব, সূরা জুমুআহ এবং সূরা মুনাফিকুন, যেগুলো সাহাবীদের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের মন্দ চরিত্রের ওপর আলোকপাত করেছে এবং এটি মনে করা অযৌক্তিক যে, মহানবী (সা.) এমন ব্যক্তিদের উম্মতের পথনির্দেশক ও নেতা বলে ঘোষণা করবেন।

৪. মাযহাব নির্বিশেষে বিভিন্ন সূত্রে মহানবী (সা.)-এর অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যেগুলো সাহাবীদেরকে একটি দল হিসাবে গণ্য করেছে। উপরিউক্ত হাদীস সেসব নির্ভরযোগ্য হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে পড়ে।[১]

৫. সুন্নী সূত্রে অনেক হাদীস রয়েছে যা উম্মাহকে সাহাবীদের অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করে। যাইন আল-ফাতা ফি তাফসীরে সূরা হাল আতা'য় আসিমী কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন :

'আমার পরে আমার সাহাবীদের দ্বারা বেদআত তৈরি করা হবে (যেমন তাদের মধ্যে যে ফিতনা হবে)। আল্লাহ্ তাদের পূর্বেকার (উত্তম) আমলের কারণে তাদের ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু যদি লোকজন আমার পরে তাদের অনুসরণ করে, তবে আল্লাহ্ তাদের জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।'

৬. মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ এমন সব কথা বলেছেন যাতে বোঝা যায় যে, উম্মতের নেতা ও পথপ্রদর্শক হওয়ার মতো যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে এমন অনেক বিবৃতি দিয়েছেন যা প্রকাশ করে যে, পথপ্রদর্শক হিসাবে কুরআনের মতো নির্দ্বিধায় অনুসরণ করার মতো যোগ্যতা তাঁদের ছিল না।[২]

হাদীসে নুজুম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকার ফলে শাহ আবদুল আযীয স্বীকার করেছেন যে, কিছু সংখ্যক সাহাবী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। কারণ, তা কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট নির্দেশের (নাস) বিপরীত। তারপরও তিনি স্বীকার করেছেন যে, যেসব ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না সেসব ক্ষেত্রে সাহাবীদের ইজতিহাদের অনুসরণ করা যাবে।

সাইয়্যেদ হামিদ হুসাইন এর জবাব দিয়েছেন এভাবে :

প্রথমত যে ব্যক্তির ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করার ব্যাপারটি নিশ্চিত সে আইনসঙ্গতভাবে পথপ্রদর্শক হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত যেখানে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও সাহাবীদের ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে যেখানে স্পষ্ট নির্দেশনা নেই সেক্ষেত্রে ভুল করার সম্ভাবনা আরও অনেক বেশি।

তৃতীয়ত যেখানে সঠিক পথপ্রদর্শক রয়েছেন– যাঁর পথনির্দেশনা এবং যাঁর পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে, সেখানে যার ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে তার অনুসরণ করার কোন অনুমতি নেই। আয়াতে তাতহীর (সূরা আহযাব : ৩৩) এবং হাদীসে সাকালাইনসহ অনেক আয়াত ও হাদীস আহলে বাইতের ইমামদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছে।

চতুর্থত সাহাবীরা শরীয়তের অনেক বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য করেছেন– যেগুলোর ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। এমন পরিস্থিতিতে তাঁদের সকলকে পথনির্দেশনার জন্য নক্ষত্রতুল্য বিবেচনা করা সম্পূর্ণরূপে ভুল।

পঞ্চমত সাহাবীরা নিজেরাই একে অপরের ভুল ধরেছেন। কখনও কখনও পরিমিতিবোধ লুপ্ত হয়েছে; একে অপরকে মিথ্যাবাদী, অজ্ঞ, এমনকি কাফের পর্যন্ত বলেছেন– যেগুলো আহলে সুন্নাতের গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয়ই বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি তাঁদের প্রত্যেককে মুসলিম উম্মাহ্র সঠিক পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করবে না।

ষষ্ঠত সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা কিয়াসের অনুশীলন করতেন যে বিষয়ে উম্মতের বিপুল সংখ্যক আইনজ্ঞ দোষারোপ করেছেন।

সপ্তমত তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন, এমনকি প্রথম তিন খলীফাও, যাঁরা শরীয়তের নানা বিধান জানার জন্য অন্যদের শরণাপন্ন হতেন। এটি মনে করা অযৌক্তিক যে, মহানবী (সা.) মতবাদগত ও আইনগত বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের উম্মতের কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত করবেন। তাঁদের মধ্যে এমনও ছিলেন যাঁরা কুরআনের কিছু শব্দের অর্থও বুঝতেন না। যেমন হযরত উমর 'কালালাহ্' শব্দের অর্থ বুঝতেন না যেটা তাবারী তাঁর তাফসীরে (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৩-২৮৪) উল্লেখ করেছেন। হযরত উমরের নিজের কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

অষ্টমত তাঁদের কেউ কেউ সুদের লেনদেনের সাথে জড়িত ছিলেন[৩], কেউ মদ বিক্রির সাথে জড়িত ছিলেন[৪] অথবা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ফতোয়া দিতেন, এমনকি মহানবী (সা.)-এর স্পষ্ট হাদীসের বিপরীতে। কেউ কেউ মহানবী (সা.)-এর সুন্নাতের বিপরীতে বেদআত সৃষ্টির দোষে দুষ্ট।

'কিতাবুল্লাহ ও আমার সুন্নাহ' সংক্রান্ত হাদীসের ওপর আলোচনা

পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে সমাজে বহুল প্রচলিত যে হাদীস বিদ্যমান তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই হাদীস :

'আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যতক্ষণ তা ধরে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।'

'মহান আল্লাহ্র কিতাব ও আমার সুন্নাহ আঁকড়ে ধর'– এ হাদীসটি অনির্ভরযোগ্য এবং এর কোন সহীহ সনদ নেই। কারণ, এ রেওয়ায়াতটি আহলে সুন্নাতের মাত্র আটজন আলেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর সবকটির সনদ দুর্বল এবং ত্রুটিযুক্ত। নিচে এ হাদীসটি নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. মালেক ইবনে আনাস বলেছেন : আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, দু'টি জিনিস আমি তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি যেগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে তোমরা কখনও গোমরাহ হবে না : মহান আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সুয়ূতীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র.), ২য় খণ্ড, তাকদীর অধ্যায়, রেওয়ায়াত ৩, পৃ. ৬১৭)

   তিনি এ হাদীসটি সনদ ছাড়াই মুরসাল রূপে বর্ণনা করেছেন।

২. ইবনে হিশাম এ রেওয়ায়াতটি মহানবী (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনিও সনদবিহীনভাবে বর্ণনা করেছেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬০৩)

৩. হাকিম নিশাবুরী এ হাদীসটি দু'টি সনদসহ বর্ণনা করেছেন যার একটি ইবনে আব্বাস এবং অপরটি আবু হুরাইরা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। (মুসতাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩)

হাকিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটির প্রথম সনদে ইসমাঈল ইবনে আবি উওয়াইস বিদ্যমান যাঁকে এক বিরাট সংখ্যক রিজালশাস্ত্রবিদ যাঈফ (দুর্বল) বলেছেন। ইবনে মুঈন বলেন : তিনি এবং তাঁর পিতা যাঈফ। নাসাঈ বলেছেন : তিনি যাঈফ। ইবনে আদী বলেছেন : তিনি তাঁর মামার কাছ থেকে বেশ কিছু গারীব (অদ্ভুত) হাদীস বর্ণনা করেছে যেগুলো কেউই গ্রহণ করেননি। ইবনে হায্ম তাঁর নিজের সনদ সহকারে সাইফ ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন : ইসমাঈল ইবনে আবি উওয়াইস হাদীস জা'ল করতেন...। (তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১)

আর দ্বিতীয় সনদে সালেহ ইবনে মূসা তালহী কুফী বিদ্যমান যাঁকে বহু সুন্নী রিজালশাস্ত্রবিদ যাঈফ বলেছেন। ইবনে মুঈন বলেন : তিনি কিছুই নন (অর্থাৎ তাঁর কোন মূল্যই নেই)। বুখারী বলেছেন : তিনি হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী। নাসাঈ বলেছেন : তিনি যাঈফ। ইবনে আদী বলেছেন : জুমহুর আলেমগণ তাঁকে গ্রহণ করেন না। আকীলী বলেছেন : তাঁর কোন হাদীসই গ্রহণযোগ্য নয়।' (তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৪)

৪. আবু বকর বাইহাকী এ হাদীসটি দু'টি সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যার একটি ইবনে আব্বাস এবং অন্যটি আবু হুরাইরা পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে। (আস-সুনানুল কুবরা, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৪)। এ সনদটিও হাকিম নিশাবুরীর সনদসমূহের মতো প্রথম সনদে ইবনে আবি উওয়াইস এবং দ্বিতীয়টিতে সালেহ ইবনে মূসা আছে যাঁদের উভয়কেই যঈফ বলে গণ্য করা হয়েছে।

৫. ইবনে আবদুল বার আল কুরতুবীও এ হাদীসটি দু'টি সূত্রে রেওয়ায়াত করেছেন। (ইবনে আবদুল বার প্রণীত আত তামহীদ)। এর প্রথম সনদ হচ্ছে ঐ সূত্র যা হাকিম আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এর মধ্যে সালেহ বিন মূসা বিদ্যমান যাঁকে অনেক রিজালশাস্ত্রবিদ যাঈফ প্রতিপন্ন করেছেন।

আর এর দ্বিতীয় সনদে কাসীর বিন আবদুল্লাহ বিদ্যমান যাঁকে একদল রিজালবিদ যাঈফ প্রতিপন্ন করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বাল তাঁকে হাদীস অমান্যকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী বলে বিবেচনা করতেন এবং তাঁর কোন মূল্যই দিতেন না। নাসাঈ তাঁকে সিকাহ (বিশ্বস্ত) বলে বিবেচনা করেননি। ইবনে আদী বলেছেন : তাঁর বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতসমূহ অনুসরণযোগ্য নয়। আলী ইবনে মাদানীও তাঁকে যাঈফ প্রতিপন্ন করেছেন। ইবনে আবদুল বার বলেছেন : তাঁর যঈফ হওয়ার ব্যাপারে রিজালশাস্ত্রবিদগণের ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে। এ ছাড়াও তিনি তাঁর পিতা ও দাদা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান বলেছেন : তাঁর দাদার সূত্রে তাঁর পিতা থেকে যেসব রেওয়ায়াত তিনি বর্ণনা করেছেন সেগুলো আসলে একটি জাল পাণ্ডুলিপির সাথে জড়িত যা গ্রন্থ হিসাবে বর্ণনা করা সঠিক নয়। (আল-ইলমা ফী যাবতির রেওয়ায়াহ ওয়া তাকঈদিস সিমা', পৃ. ৮-৯)

৬. কাযী আইয়ায এ হাদীসটি নিজ সূত্রে আবু সাঈদ খুদরীর মাধ্যমে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু (এ সনদের) এর বেশ কতিপয় রাবী যঈফ বলে গণ্য হয়েছে যে, তাঁদের মধ্যে শুআইব ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাইফ ইবনে উমরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ করে সাইফ ইবনে উমরের যাঈফ হওয়ার ব্যাপারে রিজালশাস্ত্রবিদগণের ইজমা রয়েছে। (তাহযীবুত তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৯)

৭. সুয়ূতীও উপরিউক্ত হাদীসটি হাকিম নিশাবুরীর ঐ একই সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন যা ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে। (মানাভী প্রণীত ফাইযুল কাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪০)

৮. মুত্তাকী হিন্দীও 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থে কিতাব ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। একই শিরোনামের অধীনে হাকিম ও বাইহাকীর মতো অন্যান্য হাদীসবেত্তার রেওয়ায়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং আল-ইবানাহ থেকেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন : এ হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এমন একটি হাদীসকে 'হাদীসে সাকালাইন' এর মতো মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে উপস্থাপনের কোন অবকাশই নেই।

টীকা

১. বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে (কিতাব আল-রুকুক) নিচের এই মুতাওয়াতির হাদীসটি হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন :

বুখারী মুসলিম ইবনে ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, যিনি উহাইব থেকে, তিনি আবদুল আযীয থেকে, তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেন : 'আমার কাছে হাউসের (হাউসে কাওসার) নিকট আমার সাহাবীদের একটি দলকে আনা হবে এবং আমি তাদের চিনতে পারব; তাদেরকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, (হে আল্লাহ্! তারা কি) আমার সাহাবী (নয়)? (আল্লাহ্) বলবেন, 'তুমি জান না, তোমার পরে তারা কী করেছিল!'

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে (১৪৪২ নং) মহানবী (সা.)-কে বলা হবে : 'তোমার জানা নেই যে, তোমার পর তারা কী করেছিল! তারা পতনশীল আচরণে (শির্কের অবস্থায়) ফিরে গিয়েছিল।'

বুখারী একই রকম হাদীস আর-রুকুক অধ্যায়ে হুযায়ফাহ (১৪৩৫ নং), আবদুল্লাহ্ (১৪৩৫ নং), সাহল ইবনে সা'দ (১৪৪২ নং), আবু সাইদ আল-খুদরী (১৪৪২ নং), ইবনে আব্বাস (১৪৪২ নং), আবু হুরায়রাহ (১৪৪৩ নং) এবং আসমা বিনতে আবি বকর (১৪৪৯ নং) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাফসীর ও বাদাউল খাল্‌ক অধ্যায়েও বর্ণনা করেছেন। একই হাদীস কিছু শব্দগত পার্থক্যসহ মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাযাহ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তায় (কিতাব আল-তাহারাত অধ্যায়ে, হাদীস নং ২৮) কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তায় কিতাব আল জিহাদ এ ৩২ নং হাদীস হিসাবে নিম্নের হাদীসটি এনেছেন :

মহানবী (সা.) ওহুদের শহীদদের উদ্দেশে বলেন : 'আমি তাদের ব্যাপারে সাক্ষী।' তখন আবু বকর বলেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি তাদের ভাই নই? আমরা তাদের মতো ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং তাদের মতো জিহাদ করেছি।' মহানবী (সা.) জবাব দেন : 'হ্যাঁ, কিন্তু আমি জানি না যে, আমার পরে তোমরা কী করবে...।'

উদাহরণস্বরূপ দেখুন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পণ্ডিত মাহমুদ আবু রিয়াহ প্রণীত আদওয়া আলাল সুন্নাত আল মুহাম্মাদীয়াহ, পৃ. ৩৩৯-৩৬৩, এবং আল্লামা হিল্লী কর্তৃক প্রণীত নাহজ আল হাক্‌ক ওয়া কাশ্‌ফ আস সিদ্‌ক, পৃ. ২৬২-৩৭৫; এ দু'টি গ্রন্থ

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনেক হাদীস আলোচনা করেছেন যেগুলো পথপ্রদর্শক হিসাবে রাসূলের প্রত্যেক সাহাবীর নক্ষত্রতুল্য হওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

২. ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে (লেইডেন, ১৩২২) ২য় খণ্ডের ১২৯ পৃষ্ঠায় খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হযরত আবু বকরের একটি ভাষণ উল্লেখ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন : 'আমি একজন মানুষ মাত্র এবং আমি তোমাদের চেয়ে উত্তম নই। সুতরাং আমার আনুগত্য কর যখন আমি সোজা পথে চলি এবং আমাকে সংশোধন কর যখন আমাকে ভুল পথে দেখ। তোমাদের জানা উচিত যে, (কখনও) আমি শয়তান দ্বারা প্রভাবিত হই। সুতরাং যখন তোমরা আমাকে ক্রোধান্বিত দেখ, তখন আমার থেকে দূরে থেক।' একই রকম বক্তব্য তাঁর থেকে লিপিবদ্ধ করেছেন :

ক. তাবারী তাঁর তারিখে, (কায়রো, ১৩৫৭), ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০;

খ. ইবনে কুতায়বা তাঁর আল-ইমামাহ্ ওয়াস সিয়াসাহ্ (মাকতাবাতুল ফুতুহ আল-আদাবিয়্যাহ, ১৩১), পৃ. ৬;

গ. আল হায়সামী, মাজমাউল যাওয়ায়েদ (১৩৫২), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৮৩;

ঘ. আল-মুত্তাকী, কানজুল উম্মাল (হায়দারাবাদ, ১৩১২) ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৬ এবং অন্যরা।

দ্বিতীয় খলীফা উমর প্রায়ই বলতেন, 'প্রত্যেকেরই (শরীয়ত সম্পর্কে) উমরের চেয়ে বেশি জ্ঞান রয়েছে (কুল্লু আহাদিন আ'লামু মিন উমার) এবং 'সকল লোকের (শরীয়ত সম্পর্কে) উমরের চেয়ে বেশি বুঝ আছে' (কুল্লু আহাদিন আফকাহু মিন উমার)। এর জন্য দেখুন :

ক. আল-বায়হাকী, সুনান (হায়দারাবাদ, ১৩৪৪), ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩;

খ. আল-সুয়ূতী, আল-দুররুল মানসূর (আল মাতবাআতুল মাইমানিয়্যাহ্, ১৩১৪), সূরা ৪, আয়াত ২০ এবং সূরা ৩৪, আয়াত ১৩ এর তাফসীর;

গ. আল-জামাখশারী, আল-কাশশাফ (মিসর, ১৩৫৪), সূরা ৪, আয়াত ২০ এবং সূরা ৩৪, আয়াত ১৩ এর তাফসীর;

ঘ. আল-মুত্তাকী, কানজুল উম্মাল, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮;

ঙ. আল-হায়সামী, মাজমাউল যাওয়ায়েদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

৩. হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে যায়েদ ইবনে আরকাম এবং একজন মহিলার লেনদেনের বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে :

ক. আবদুর রাযযাক, আল মুসান্নাফ;

খ. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল, তাঁর মুসনাদে;

গ. আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআনে;

ঘ. আল-সারাখশী, মাবসুত;

ঙ. আল-দাবুসী, তাসীস আন-নাযার, এবং অনেক সুন্নী আইনজ্ঞ, হাদীসশাস্ত্রবিদ এবং তাফসীরকারই তাঁদের গ্রন্থাদিতে এটি উল্লেখ করেছেন।

৪. বুখারী, মুসলিম, দারিমী, ইবনে আবি শায়বাহ, নাসাঈ, ইবনে আসির, গাযযালী, মুত্তাকী, ইবনে খালদূন এবং আবু হিলাল আল-আসকারী কতিপয় হাদীস উল্লেখ করেছেন যেখানে কতিপয় সাহাবী কর্তৃক মদ বিক্রির বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

(প্রবন্ধটির প্রধান অংশ সংকলিত হয়েছে প্রখ্যাত ভারতীয় আলেম সাইয়্যেদ হামিদ হুসাইন লক্ষৌভী রচিত 'আবাকাত আল আনওয়ার' থেকে।)

‘হাদীসে বিদআ’ এর ওপর একটি পর্যালোচনা

এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

ভূমিকা

সত্যকে স্পষ্টকারী গুরুত্বপূর্ণ হাদীসসমূহের মধ্যে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত তাঁর পবিত্র দুহিতা ফাতেমা (আ.) সম্পর্কিত একটি হাদীস হলো ‘ফাতেমা আমার অস্তিত্বের বা সত্তার অংশ। যে কেউ তাকে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করল সে আমাকেই অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করল।’ আলোচ্য হাদীসটি ‘হাদীসে বিদআ’ নামে প্রসিদ্ধ। ধর্মীয় আলোচক ও বিশেষজ্ঞদের এ হাদীসটির ওপর গবেষণায় প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যেই এ সংক্ষিপ্ত লেখনিটি উপস্থাপিত হচ্ছে। আশা করছি চিন্তাশীল পাঠকমণ্ডলী এ প্রবন্ধ থেকে উপকৃত হবেন।

হাদীসের বর্ণনা

বুখারী বর্ণনা করেছেন : আবুল ওয়ালিদ, আবু উয়াইনা থেকে এবং তিনি আম্‌র ইবনে দিনার থেকে এবং তিনি ইবনে মুলাইকা থেকে এবং তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন : ‘ফাতেমা আমার সত্তার অংশ। যে কেউ তাকে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করল, সে আমাকেই অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করল।’[১]

মুসলিম বর্ণনা করেছেন : আবু মুয়াম্মার ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম আল হাযালি, সুফিয়ান থেকে, তিনি ইবনে আবি মুলাইকা থেকে এবং আবি মুলাইকা মিসওয়ার ইবনে মাখরামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বলেছেন : ‘ফাতেমা আমার অস্তিত্বের অংশ, যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।’[২]

আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী তাঁর 'ফাযায়েল' গ্রন্থে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন : 'নিশ্চয় ফাতেমা আমার অস্তিত্বের অংশ, যে তাকে ক্রোধান্বিত করল, সে আমাকেই ক্রোধান্বিত করল।[৩] হাকিম স্বীয় সূত্রে মিসওয়ার থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন : 'ফাতেমা আমার অস্তিত্বের অংশ। যা তাকে অসন্তুষ্ট করে আমিও তাতে অসন্তুষ্ট হই এবং যা তাকে আনন্দিত করে আমিও তাতে আনন্দিত হই।'[৪]

হাদীসের অর্থ এবং বিভিন্ন দিক

উল্লিখিত হাদীসগুলো বিভিন্ন শব্দবিন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এবং তা বিশেষজ্ঞ আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে হাদীসের দু'টি বাক্যাংশ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয় মনে করছি :

প্রথমটি হলো 'ফাতিমা আমার অংশ বা আমার অস্তিত্বের অংশ'। হাদীসটিতে 'বাদআ' বা 'বিদআ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে কাসীর বলেন : 'বাদআতুন' অর্থ মাংসের টুকরা বা অংশ। কখনও কখনও এটি 'বিদআতুন'ও উচ্চারিত হয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই বাক্যটির অর্থ 'সে আমার অংশ।' যেহেতু কারো মাংসের টুকরা তার দেহের ও তার সত্তার অংশ[৫] বলে গণ্য সেহেতু হাদীসটির 'বিদআতুন' শব্দকে অস্তিত্বের অংশ বা সত্তার অংশ অর্থ করা যায়।

ইবনে মানযুর বলেন : 'অমুক অমুকের অংশ, এর অর্থ সে তার অনুরূপ।' অতঃপর তিনি আলোচ্য হাদীসটিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬]

উপরিউক্ত অর্থের ভিত্তিতে ফাতেমা যাহরা (আ.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অংশ। তবে হতে পারে তা রূপক অর্থে সদৃশ বুঝাতে অথবা প্রকৃত অর্থেই রাসূল (সা.)-এর অংশ নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তা তাঁদের দুয়ের মধ্যে বিদ্যমান অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে নতুবা তা অস্তিত্বগতভাবে রাসূল (সা.) ও ফাতেমা যাহরার মধ্যে যে বাস্তব সম্পর্ক রয়েছে তারই প্রমাণ বহন করছে।

উভয় ক্ষেত্রেই হাদীসের 'ফাতেমা আমার অস্তিত্বের অংশ' বাক্যটির মধ্যে এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) ফাতেমার ক্রোধে ক্রোধান্বিত হন এবং তাঁর

সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন। কিন্তু তদুপরি হাদীসটিতে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাতে পরবর্তী বাক্যে তা পুনরায় উল্লেখ করে এ বিষয়টির ওপর তাগিদ করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'ফাতেমা আমার অস্তিত্বের অংশ' হাদীসটি আমাদেরকে রাসূল (সা.)-এর হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বলা এ হাদীসটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় : 'আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে।'[৭]

আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী তাঁর 'ফাযায়েল' গ্রন্থে ইমরান ইবনে হুসাইন সূত্রে মহানবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন : 'নিশ্চয় আলী আমার থেকে এবং আমি আলীর থেকে এবং সে আমার পর সকল মুমিনের অভিভাবক।'[৮]

তিনি হাবাশী ইবনে জুনাদা আস সুল্লুলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন : 'আলী আমার থেকে এবং আলী ব্যতীত কেউ আমার পক্ষ থেকে কোন কাজ করবে না।'[৯]

অনুরূপ হাদীস ইবনে আবি শাইবা কুফী, যাহ্হাক, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজা, তাবারানী, সুয়ূতী, মুত্তাকী হিন্দী ও অন্যরাও বর্ণনা করেছেন।

আহলে সুন্নাতের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন এ আলেমদের–যাঁদের গ্রন্থ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী–বর্ণনার বিপরীতে নাসিরুদ্দীন আলবানী কর্তৃক হাদীসটিকে বিভিন্ন সূত্রে দুর্বল বলার যুক্তির প্রতি কর্ণপাত করা যায় না। কারণ, হাদীসটি দু'একটি সূত্রে দুর্বল হলেও সকল সূত্রে দুর্বল নয়; বরং হাদীসটির মূল পাঠ বিভিন্ন সূত্রে হুবহু বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হওয়াকে সত্য বলে প্রমাণ করে। এ কারণেই তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান', 'গারীব' ও 'সহীহ' বলে অভিহিত করেছেন।[১০]

হাদীসটি 'গারীব' (যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী কর্তৃক বর্ণিত) হওয়ার বিষয়টি তার সত্যতার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলে না। যেহেতু আহলে সুন্নাতের সংজ্ঞা মতো হাদীসের বর্ণনা ধারায় কোন একটি স্তরে যদি বর্ণনাকারীর সংখ্যা এক হয়ে থাকে তাও গারীব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত,[১১] সেহেতু গারীব হাদীসকে সঠিক বলে ধরতে এবং তা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, সহীহ ও হাসান হাদীসের ক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারে। যেমনটি উপরিউক্ত হাদীসের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তদুপরি যদি আমরা গারীব হওয়ার কারণে কোন হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করি, সেক্ষেত্রে

সুনানে আবু দাউদ ও দারে কুতনীর মতো প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ হাদীসকে গারীব হওয়ার কারণে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

সুতরাং আলোচ্য হাদীসের ক্ষেত্রে গারীব হওয়া কোন সমস্যা নয়। তাছাড়া আহমদ ইবনে শুয়াইব নাসায়ী সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি গাবীর নয়। স্বয়ং আলবানী তাঁর সিলসিলাতুল আহাদিসুস সাহীহা গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ২৬১-২৬২ পৃষ্ঠায় একটি সহীহ সূত্রে (২২২৪ নং) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদের গবেষক হামযা আহমাদ আযযাইনও আলোচ্য হাদীসের টীকায় এটিকে সহীহ বলেছেন।

আল্লামা মানাভী বলেন : 'আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে'– মহানবী (সা.)-এর এ হাদীসটির অর্থ হলো আলী বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ভালবাসা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং আমিও তার সঙ্গে ঐ সকল ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত। এ কারণেই হাদীসটিতে এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও সংযুক্তির কথা বলা হয়েছে। আরবদের ভাষায় বিষয়টি এভাবে বলা হয়ে থাকে যে, অমুক অমুকের সাথে এতটা সম্পৃক্ত যে, তারা যেন একে অপরের সাথে একীভূত হয়েছে।[১২]

যখন কেউ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা যাহরার মধ্যে বিদ্যমান বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়টিকে দৃষ্টি দেন তাহলে লক্ষ্য করবেন যে, তাঁদের মধ্যে এই সম্পর্কটি সকল দিক থেকে পূর্ণ। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের মধ্যে মিল ও সম্পর্ক রয়েছে। যদি আমরা 'যে আলীকে কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট দিল' এবং 'আলী আমার থেকে এবং আমি আলী থেকে' বাণী দু'টির পাশে 'ফাতেমা আমার অস্তিত্বের অংশ; যে তাকে কষ্ট দিল, সে আমাকেই কষ্ট ছিল' এবং 'ফাতেমা আমার অংশ; যে তাকে ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট করল, সে আমাকেই ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট করল' বাণী দু'টিকে মিলিয়ে দেখি, তবে পবিত্র কুরআনের 'আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর'– এ আয়াতটির সত্যতাই আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে যে, পূর্ণতা ও আধ্যাত্মিক মর্যাদার দৃষ্টিতেও মহান আল্লাহ্ এরূপ জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। সকল ক্ষেত্রেই আলী ও ফাতেমা পরস্পরের জুড়ি ও সমকক্ষ ছিলেন। উপরিউক্ত হাদীসগুলোর 'আমার অংশ' ও 'আমার থেকে' কথাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, যে বিশেষ ক্ষেত্রকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে তা ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সকল বৈশিষ্ট্য ও অধিকার তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই

নবুওয়াতের বিষয়টিকে বাদ দিলে তাঁরা বাকী সকল বৈশিষ্ট্য ও আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

নবম হিজরিতে রাসূল (সা.) সূরা তওবার প্রথম কয়েকটি আয়াত প্রচারের জন্য হযরত আবু বকরের নেতৃত্বে হজ্বের দল প্রেরণ করলে জিবরাঈল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে বলেন : 'এ আয়াত আপনি অথবা এমন কেউ যে আপনার থেকে সে ছাড়া কেউ প্রচারের অধিকার রাখে না।' তখন রাসূল (সা.) হযরত আলীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে প্রেরণ করেন।[১৩]

একইরূপ ঘটনা হযরত ফাতেমা (আ.)-এর ক্ষেত্রেও ঘটেছে যখন আবু লুবাবা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় অনুশোচিত হয়ে তওবার উদ্দেশ্যে নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেন যে, স্বয়ং রাসূল (সা.) যদি এসে তাঁকে মুক্ত না করেন তাহলে তিনি ঐ অবস্থায়ই থাকবেন। তাঁর তওবা গৃহীত হলে হযরত ফাতেমা তাঁকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে গেলে তিনি আপত্তি জানান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : 'নিশ্চয় ফাতেমা আমার মাংসপিণ্ড।' অতঃপর ফাতেমা তাঁর বাঁধন খুলে দেন।[১৪]

হাদীসটির দ্বিতীয় অংশ হলো ফাতেমার ক্রোধে রাসূল (সা.) ক্রোধান্বিত হন অর্থাৎ যে ফাতেমাকে ক্রোধান্বিত করে সে রাসূলকেই ক্রোধান্বিত করে।

প্রথমে আমরা বাক্যাংশের অর্থ ও অনুরূপ বর্ণনা থেকে তার মধ্যে যে মূল্যবান সম্পদ লুক্কায়িত রয়েছে তা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করব। তিনটি শিরোনামে আমরা আলোচনাটি উপস্থাপন করব।

প্রথমত ফাতেমার ক্রোধে রাসূলের ক্রোধান্বিত হওয়ার বিষয়টি অসংখ্য গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ব্যতীত অন্যদের সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তবে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো তাতে ফাতেমার ক্রোধে, এমনকি আল্লাহ্‌ও ক্রোধান্বিত হন বলে বলা হয়েছে। আমরা এরূপ কয়েকটি বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করছি।

হাকেম তাঁর 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন : আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব, হাসান ইবনে আলী ইবনে আফ্‌ফান আল আমেরী থেকে, তিনি কুফার অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে দুহাইম থেকে, তিনি আহমাদ ইবনে হাতিম

থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আলী ইবনে হুসাইন থেকে এবং তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আলী ইবনে আবি তালিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফাতেমাকে বলেন : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার ক্রোধে ক্রোধান্বিত হন এবং তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।'[১৫]

হাকেম এ হাদীসটির টীকায় বলেন : 'হাদীসটি সহীহ সূত্রে বর্ণিত। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম তা বর্ণনা করেননি। উল্লেখ্য, বুখারী ও মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থে সকল সহীহ হাদীস বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে রচনা করেননি। এ কারণেই বুখারী তাঁর 'তারিখুল কাবীর' গ্রন্থে অসংখ্য হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু তাঁর সহীহ গ্রন্থে তা অন্তর্ভুক্ত করেননি।

যাহ্হাক বর্ণনা করেছেন : আবদুল্লাহ্ ইবনে সালিম আল-মাফলুয, যিনি সর্বজন প্রশংসিত ব্যক্তি ছিলেন, তিনি হুসাইন ইবনে যাইদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব থেকে, তিনি উমর ইবনে আলী ইবনে জাফর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) ফাতেমাকে বলেন : 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার ক্রোধে ক্রোধান্বিত এবং তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।'[১৬]

তাবারানী বর্ণনা করেন : মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আল হাদরামী, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালিম আল-কাবযাজ হতে, তিনি হুসাইন ইবনে যাইদ ইবনে আলী হতে, তিনি আলী ইবনে উমর ইবনে আলী হতে, তিনি জাফর ইবনে মুহাম্মাদ হতে, তিনি তাঁর পিতা হতে, তিনি আলী ইবনে হুসাইন হতে, তিনি হুসাইন ইবনে আলী (রা.) হতে, তিনি আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ফাতেমাকে বলেন : 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার ক্রোধে ক্রোধান্বিত হন এবং তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।'[১৭]

হাইসামী বলেন : হাদীসটি তাবারানী হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১৮] সালিহী আশ-শামীও হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।[১৯]

অনেক হাদীসবেত্তার দৃষ্টিতেই হাদীসটি মুস্তাফিয (বর্ণনাকারীদের প্রতিটি স্তরে তিন অথবা তার অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী রয়েছে) সূত্রে বর্ণিত এবং তার বর্ণনাকারীরা বিশ্বস্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

দ্বিতীয়ত হাদীসের এ অংশটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ফাতেমাকে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত করা হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করা অপরিহার্য। এমনকি তাঁকে কষ্ট দান ও ক্রোধান্বিত করা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌কে ক্রোধান্বিত করার শামিল। যেমনভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করা মহান প্রতিপালকের রহমতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ।

তৃতীয়ত বর্ণিত অংশটি থেকে হযরত ফাতেমা যাহরা (আ.)-এর নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টিও প্রমাণিত হয়। কারণ, মহান সৃষ্টিকর্তা কখনই অন্যায় বিষয়ে সন্তুষ্ট ও অন্যায়ভাবে ক্রোধান্বিত হন না; বরং তাঁর সন্তুষ্টি ও ক্রোধের মানদণ্ড হলো সত্য ও ন্যায়। তাই হযরত ফাতেমা অযাচিত বা অনুচিত কারণে ক্রোধান্বিত হলে তিনি ক্রোধান্বিত হতে পারেন না, যেমনভাবে সত্যনিষ্ঠ বিষয়ে হযরত ফাতেমা সন্তুষ্ট না হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। সুতরাং যখন বলা হয়েছে আল্লাহ্‌ নিঃশর্তভাবে ফাতেমা (আ.)-এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হন, তখন নিঃসন্দেহে বলা যায়, হযরত ফাতেমার ক্রোধ, সন্তুষ্টি, আনন্দ ও বিষন্নতা সব সময়ই আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও সন্তুষ্টির অনুগত। তিনি কখনই পার্থিব ও বৈষয়িক কারণে কারো ওপর ক্রোধান্বিত বা অন্যায়ভাবে কারো প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হননি।

এ কারণেই আস-সুহাইল আল-মালিকী[২০] তাঁর 'আর-রাউযুল আনিফ' গ্রন্থে আবু লুবাবার পূর্বোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেছেন : 'এ হাদীসটি প্রমাণ করে, যে হযরত ফাতেমাকে গালমন্দ করে সে কাফের (কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়েছে) এবং যে তাঁর জন্য দোয়া করে ও তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে সে তাঁর পিতার প্রতি দরূদ প্রেরণ করেছে।'[২১]

উপরিউক্ত সহীহ হাদীসের আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় :

১. হযরত ফাতেমা (আ.) যখন কোন ব্যক্তির ওপর ক্রোধান্বিত হন তখন মহান আল্লাহ্‌ও ঐ ব্যক্তির ওপর ক্রোধান্বিত হন।

২. যখন মহান আল্লাহ্‌ কোন ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হন তখন নিঃসন্দেহে সে জাহান্নামে পতিত হবে। স্বয়ং আল্লাহ্‌ এ সম্পর্কে বলেন : 'যার ওপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হয় নিশ্চয় সে জাহান্নামে পতিত হয়।' (সূরা ত্বাহা : ৮১)

৩. উক্ত আয়াতে 'জাহান্নাম' ইঙ্গিত করতে 'হাওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হাওয়া হলো ঐ স্থান যেখানে উত্তপ্ত অগ্নি রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ সূরা আল-কারিআতে বলেছেন : 'তার (পাপী ব্যক্তির) স্থান হবে 'হাভিয়া'। এবং কী তোমাকে অবহিত করেছে যে, এটা কী? এটি অতি উত্তপ্ত অগ্নি।'

৪. সুতরাং যে হযরত ফাতেমাকে কোনভাবে ক্রোধান্বিত করবে সে অতি উত্তপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। এখন এই ক্রোধান্বিত করা তাঁর সম্পদ ও অধিকার হরণ করার মাধ্যমেই হোক অথবা তাঁর সন্তানদের হত্যা করার মাধ্যমেই হোক (যেমনটি কারবালায় ইমাম হুসাইন ও তাঁর সন্তানদের ক্ষেত্রে ঘটেছে)।

উক্ত হাদীস থেকে অন্য যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হলো :

প্রথমত যখন হযরত ফাতেমা (আ.) কোন ব্যক্তির ওপর সন্তুষ্ট হবেন মহান আল্লাহ্ও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হবেন।

দ্বিতীয়ত যে (হযরত ফাতেমাকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে) মহান আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করবে সে এ আয়াতের (তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।– সূরা মুজাদালা : ২২) ভিত্তিতে আল্লাহ্র দলে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা শুধু তাদের জন্যই শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন : 'তারা (ফেরেশতাগণ) ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যার প্রতি তিনি (আল্লাহ্) সন্তুষ্ট, অন্য কারো জন্য সুপারিশ করবে না।' (সূরা আম্বিয়া : ২৮)

মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের অস্তিত্বের অংশ হযরত ফাতেমা যাদের প্রতি সন্তুষ্ট আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

তথ্যসূত্র

১. সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১০, 'মানাকিবুল মুহাজিরিন ওয়া ফাযলুহুম' অধ্যায়, দারুল ফিক্র প্রকাশনী, বৈরুত, প্রকাশকাল ১৪০১ হিজরি।

২. সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৪১, দারুল ফিক্র প্রকাশনা, বৈরুত।

৩. নাসায়ী, ফাযায়েলুস সাহাবা, পৃ. ৭৮, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত।

৪. মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, ১৩৯৮ হিজরি।

৫. আন-নিহায়া ফি গারীবিল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২৩ হিজরি।

৬. লিসানুল আরাব, 'বাদ' ধাতুমূল।

৭. হাদীসটি ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিসদের (হাদীস বিশেষজ্ঞদের) অনেকেই বর্ণনা করেছেন। যেমন তাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১৪; ইবনে আসীর, আল-কামিল ফিত তারিখ; ইবনে আবিল হাদীদ, শারহে নাহজুল বালাগা, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৮২; তারিখে মাদিনাতে দামেস্ক, হযরত আলীর পরিচিতি পর্বে, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮-১৫০; আল আগানী, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ১৭। হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সহীহ তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৬, হাদীস নং ৩৭১৯; সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪, হাদীস নং ১১৯; আল-মুসনাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬৪, মুসনাদে আহমাদ, গবেষণা : হামযা আহমাদ আযযাইন, ১৬তম খণ্ড, পৃ.৪৯৭, হাদীস নং ২২৯০৮; সুয়ূতী, তারিখুল খুলাফা, পৃ. ১৬৯; তাবারানী, আল মোজামুল কাবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬; মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া প্রকাশনা, কায়রো, দারু ইহয়িয়াউত তুরাসিল আরাবি ছাপাখানা, বৈরুত।

৮. ফাযায়িলুস সাহাবা, পৃ. ১৫।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. তিরমিজী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩০০, গবেষণা ও সম্পাদনা : আবদুর রহমান মুহাম্মাদ উসমান, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪৫৩ হিজরি, দারুল ফিক্‌র প্রকাশনা, বৈরুত।

হাসান, গারীব ও সহীহ-এর সংজ্ঞা হলো যথাক্রমে যে হাদীসের বর্ণনাকারীরা সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত, কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তির স্মরণশক্তির ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে, যে হাদীসের সূত্রে প্রত্যেক বা কোন এক স্তরে শুধু একজন বর্ণনাকারী বিদ্যমান থাকায় প্রসিদ্ধ নয় এবং যে হাদীসের বর্ণনাকারীরা সকলেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত এবং স্মরণশক্তির ক্ষেত্রেও দুর্বলতা নেই এবং হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত ও বিরল বলে গণ্য নয়।

১১. ড. আত-তাহান, তাইসিরু মুসতালা হিল হাদীস, পৃ. ২৮।

১২. ফাইজুল কাদীর বিশারহে জামিউস সাগীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭০, সম্পাদনা : আহমাদ আবদুস সালাম, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া প্রকাশনা, বৈরুত।

১৩. মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২২, হাদীস নং ১২৯৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩; দুররুল মানসূর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১; আল খাসায়েস, পৃ. ২০।

১৪. আবদুর রহমান আস সোহাইলী, আর-রাউজুল আনিফ ফি শারহিস সিরাতিন্নাবাভীয়া লি ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮, গবেষণা ও টীকা সংযোজন : আবদুর রহমান ওয়াকিল, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, কায়রো।

১৫. হাকেম নিশাবুরী, আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩।

১৬. আল-আহাদ ওয়াল মাসানী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৩, গবেষণা : কাসেম ফাইসাল আহমাদ আল-জাওয়াবেরা, দারুত দারিয়া, আর-রিয়াদ, প্রথম প্রকাশ ১৪১১ হিজরি।

১৭. আল-মোজামুল কাবীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮, গবেষণা ও সংকলন : হামদী আবদুল মাজিদ আস-সালাফী, দ্বিতীয় সংস্করণ, দারু ইহয়িয়াউত তুরাসিল আরাবি ছাপাখানা, বৈরুত।

১৮. মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২০৩, দারুল কুতুব, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।

১৯. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতি খাইরিল ইবাদ, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৪৪, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত।

২০. তাঁর পূর্ণ নাম হলো আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমাদ ইবনে আসবাগ আল-খাসআমি আস-সুহাইলী আল-আন্দালুসী আল-মালিকী, তিনি একজন ঐতিহাসিক, হাদীসবিদ, কুরআনের হাফেয, সাহিত্যিক, ব্যাকরণবিদ ও আভিধানিক ছিলেন, তবে তিনি অন্ধ ছিলেন। তিনি ইবনিল আরাবি মালিকী ও অন্যদের নিকট শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তাঁর বিরল প্রতিভার খ্যাতি মরক্কো পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তাঁকে শিক্ষাদানের জন্য সেখানে আসতে আহ্বান জানানো হলে তিনি সেখানে হিজরত করেন এবং তারা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে।

২১. আর-রাওজুল আনিফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২৮।

নীতিবিজ্ঞান

নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হিংসা

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে ইহুদীরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হতো তখন তারা এ কথা বলে দো'আ করত : 'ইলাহী! সেই পয়গাম্বরের উসিলায় যাঁকে প্রেরণ করার ওয়াদা তুমি আমাদের দিয়েছ এবং সেই কিতাবের উসিলায় যা তাঁর প্রতি নাযিল করবে, আমাদের বিজয় দান কর।' এ দো'আর বরকতে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করত। কিন্তু রাসূলে করীম (সা.) হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে জন্মগ্রহণ করলে তারা হিংসাবশত তা মানতে অস্বীকার করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتَٰبٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ وَكَانُواْ مِن قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٨٩

'তাদের কাছে যখন আল্লাহর পক্ষ হতে গ্রন্থ (কুরআন) আসল যেটা তাদের সাথে যা আছে (তাওরাত) তার সত্যায়ন করে এবং ইতঃপূর্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভের প্রার্থনা করত, অতঃপর যা তারা জানত তা যখন তাদের নিকট আসল তখন তা অস্বীকার করল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।'[১]

হিংসার কারণেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়।[২] হযরত আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করলে হাবিলের কুরবানী কবুল হয়। তখন কাবিল হিংসাবশত তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হিংসাকে এমন রোগ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন যা ধর্মকে ধ্বংস করে দেয়। তিনি বলেন : 'স্মরণ রেখ। বিগত উম্মতদের ব্যাধি তোমাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। আর সেই ব্যাধি হলো হিংসা যা তোমাদের মাথার চুলকে মুণ্ডন করে না; বরং তোমাদের ধর্মের মস্তককেই মুণ্ডন করে দেয়।'[৩]

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'হিংসা-বিদ্বেষ হলো সকল হীনতার উৎসস্বরূপ।'[৪]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : 'কুফ্‌রের ভিত্তি তিনটি : লোভ, অহংকার ও হিংসা-বিদ্বেষ।'[৫]

হিংসার কারণ

১. সমকক্ষ ব্যক্তির মান-সম্মান অসহ্য হওয়া : যদি সমকক্ষ ব্যক্তি শাসনক্ষমতা, ধন-সম্পদ অথবা বিদ্যার অধিকারী হয় তাহলে হিংসাকারী আশংকা করে যে, এতে সেই ব্যক্তি তার ওপর অহংকার করবে। এ থেকে হিংসা আসে। অপর ব্যক্তি কেন তার চেয়ে জ্ঞানীগুণী হবে?

২. অপরকে হেয় মনে করা : এক ব্যক্তি অপরকে হেয় মনে করে তার কাছ থেকে আনুগত্য আশা করে। এখন যদি সে নেয়ামতপ্রাপ্ত হয় তাহলে হিংসাকারী আশংকা করে যে, সে তার আনুগত্য করবে না এবং তার সমকক্ষ হওয়ার দাবি করবে।

৩. আশ্চর্যবোধ করা : হিংসাকারী যখন কোন ব্যক্তির বড় নেয়ামত ও পদমর্যাদা দেখে তখন আশ্চর্যবোধ করে যে, আমি তো তারই মতো একজন, অথচ আমি তা পাইনি।

৪. ক্ষমতার মোহ : এরূপ কামনা করা যে, আমি যেমন কবি, সাহিত্যিক, বীর, জ্ঞানী, অন্য কেউ যেন এমন না হয়। এতে সবাই প্রশংসা করবে। ইহুদী পণ্ডিতরা রাসূলকে মানতে অস্বীকার করার কারণ হল তাদের জ্ঞান রহিত হয়ে যাবে, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণ হয়ে যাবে।

৫. প্রতিযোগিতা : প্রতিযোগিতার কারণে হিংসার উদ্ভব হতে পারে। যেহেতু প্রতিযোগিতায় কেবল এক ব্যক্তিই শীর্ষ স্থান লাভ করে, সেহেতু অবশিষ্টরা নিজেদেরকে যোগ্য মনে করে ঐ ব্যক্তির প্রতি হিংসা পোষণ করতে থাকে।

৬. অন্তরের হীনমন্যতা : অনেক মানুষ রয়েছে যাদের হিংসার ভিত্তি হল অন্তরের হীনমন্যতা। এমন মানুষ যাদের কোন কিছুর প্রতিই মোহ নেই, কিন্তু যখন তার সামনে কারও ব্যাপারে আলোচনা করা হয়, তখন তার কাছে তা দুঃসহ মনে হয়। আবার অপরের দুর্দশা বর্ণনা করলে আনন্দিত হয়। অর্থাৎ এ ধরনের লোক কারও সফলতা ও সুখ সহ্য করতে পারে না।

৭. পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ : একটি পরিবারের মধ্যেও হিংসার উৎপত্তি হতে পারে। যদি বাবা-মা সন্তানদের মধ্যে কারও প্রতি বিশেষ ভালবাসা ও মমতা প্রদর্শন করে তাহলে বাকী সন্তানদের মধ্যে অপমান ও বিদ্রোহের ভাব জন্ম নেবে এবং সে হিংসাপরায়ণ হয় উঠবে। আর তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসলমানদের তাদের সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উপঢৌকন বিতরণের সমতা রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হিংসার পরিণাম

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'অগ্নি যেমন লাকড়িকে খেয়ে ফেলে, তেমনি হিংসা সৎকাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়।'[৬]

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'হিংসা-বিদ্বেষের ফল হলো ইহকাল ও পরকালের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা।'[৭]

হিংসুক ব্যক্তিরা যদি তাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে স্বাভাবিক পথের বাইরে না ব্যয় করে তাদের জীবনকে লক্ষ্যপথে ব্যয় করত তাহলে তাদের জীবন সুখে পরিপূর্ণ হয়ে যেত। হিংসা যেমন মনের আনন্দ কেড়ে নেয়, তেমনি তা শারীরিক দিক থেকেও মানুষকে অসুস্থ করে ফেলে।

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'হিংসা-বিদ্বেষ হলো এমন রোগ যাতে প্রশান্তি লাভ অসম্ভব।'[৮]

হযরত আলী (আ.) বলেছেন : 'হিংসা মানুষের দৈহিক উন্নতির অন্তরায়।'[৯]

তিনি আরও বলেছেন : 'হিংসা হতে তোমরা নিজেদের রক্ষা কর। কেননা, এটি আত্মাকে উপহাস করে।'[১০]

তিনি আরও বলেছেন : 'হিংসা-বিদ্বেষ শরীরকে গলিয়ে দেয়।'[১১]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : 'পরশ্রীকাতরতা আত্মার অন্ধত্ব ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অস্বীকৃতি হতে জন্মলাভ করে এবং এ দু'টি হচ্ছে অবিশ্বস্ততার দু'টি উপাদান। ঈর্ষার কারণেই আদম সন্তানকে অনন্তকালের জন্য দুঃখ-যন্ত্রণার শিকারে পরিণত হতে হয়েছে এবং অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করতে হবে যা থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই।'[১২]

প্রতিকার

মূলত হিংসার কারণগুলোর উৎপত্তি হচ্ছে দুনিয়ায় প্রতি ভালবাসা। দুনিয়ায় একে অপরের থেকে ধন-সম্পত্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, বংশমর্যাদা সবদিক থেকেই প্রাধান্য লাভ করতে চায় বলেই অপরের অবস্থানকে হিংসার দৃষ্টিতে দেখে। তাই দুনিয়ায় অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবার বাসনা তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তাকে তার জ্ঞান-বুদ্ধির ব্যবহারের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে যে, যার প্রতি হিংসা করা হচ্ছে এতে তার কোন ক্ষতিই হবে না; বরং সে নিজেই এর ফলে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুনিয়াতে তার ক্ষতি হলো সে অন্তরের প্রশান্তি হারিয়ে ফেলে, কারণ শত্রুদের প্রতি যতই আল্লাহ্‌র নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে সে ততই কষ্ট পেতে থাকে। আর এভাবে সারাক্ষণ কষ্ট ভোগ করার ফলে সে শারীরিকভাবেও অসুস্থ হয়ে পড়ে। অপরদিকে আখেরাতে তার ক্ষতি হলো তার সমুদয় সৎকাজ ধ্বংস হয়ে যায়। তাই মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে হিংসাকে প্রতিহত করবে।

ঈর্ষা (গিবতাহ)

যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি যে নেয়ামত পেয়েছে সেটাকে খারাপ মনে না করে এবং তার বিলুপ্তিও কামনা না করে; বরং সে চায় যে, সেও যেন এমন নেয়ামত লাভ করে– তাহলে তার এ অবস্থাকে গিবতাহ বা ঈর্ষা বলা হয়।

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'মুমিন ব্যক্তি ঈর্ষা পোষণ করে এবং মুনাফিক হিংসা করে।'[১৩]

আরবি 'হাসাদ' শব্দের অর্থ কখনও কখনও ঈর্ষাও করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'দু'ব্যক্তির ব্যাপারে হাসাদ ঈর্ষা করা যায় : প্রথম যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দ্বিতীয়, যাকে আল্লাহ্ এল্ম দিয়েছেন, অতঃপর সে তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।'[১৪]

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : 'ভাল আশা এবং মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা কর এবং তোমার পুরস্কার ক্রমেই বাড়তে থাকবে।'[১৫]

কামনা-বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা

মহান আল্লাহ্ মানুষকে প্রবৃত্তি এবং কামনা-বাসনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যেন সে তার জীবন ধারণ করতে পারে। যদি এগুলোর নিয়ন্ত্রিত ও সঠিক ব্যবহার করা হয় তাহলে তা তাকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করে। আমাদের আকাঙ্ক্ষাও এ রকম একটি মাধ্যম। যদি মানুষের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা না থাকত তবে তার জীবনই অচল হয়ে পড়ত।

মহানবী (সা.) বলেন : 'আশা হলো আমার উম্মতের জন্য রহমত। যদি আশা-আকাঙ্ক্ষা না থাকত তাহলে কোন মা তার সন্তানকে দুধ খাওয়াত না এবং কোন মালি কোন চারাগাছ রোপন করত না।'[১৬]

একটি বর্ণনায় এসেছে যে, ঈসা (আ.) একদিন একজন বৃদ্ধ লোককে জমি চাষ করতে দেখলেন। ঈসা (আ.) আল্লাহ্র কাছে ঐ বৃদ্ধ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা উঠিয়ে নেওয়ার প্রার্থনা করলেন। তারপর তিনি দেখলেন যে, বৃদ্ধ লোকটি কোদাল ফেলে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এরপর ঈসা (আ.) আল্লাহ্র কাছে তার আকাঙ্ক্ষা ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি দেখলেন, বৃদ্ধ লোকটি উঠে দাঁড়াল এবং কাজ করতে শুরু করল। ঈসা (আ.) তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে জবাব দিল : যখন আমি কাজ করছিলাম তখন মনে মনে চিন্তা করলাম : কত সময়ই আর তোমাকে কাজ করতে হবে যখন তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেছ। তখন আমি আমার কোদাল ফেলে দিলাম এবং বিশ্রাম নেওয়া শুরু করলাম। তারপর চিন্তা করলাম : আল্লাহ্র

কসম, যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন আমার জীবন ধারণের উপকরণ লাগবে। তখন আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং কাজ শুরু করলাম।[১৭]

এ দু'টি বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু পূর্বে যেমন বলা হয়েছে যে, আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষের জন্য ভাল যদি তা সতর্কতার সাথে পূরণ করা হয়। আর যদি তা চরম হয়ে যায় তাহলে তা সমাজকে ধ্বংস করে দেয়।

ইমাম আলী (আ.) তাঁর এক বক্তব্যে বলেন : 'হে লোকসকল! তোমাদের ব্যাপারে আমি দু'টি বিষয়কে বড় ভয় করি : কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে আমল করা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রলম্বিত করা। কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে সত্যকে পাওয়া যায় না এবং আশা প্রলম্বিত করলে পরকালকে ভুলে থাকে। জেনে রাখ, দুনিয়া অতি দ্রুত অন্তের দিকে চলে যাচ্ছে এবং শেষ কণিকা ছাড়া এতে আর কিছুই থাকবে না; কেউ কোন পাত্র নিঃশেষ করে ফেললে একটু তলানী থাকে। সাবধান! পরকাল এগিয়ে আসছে। দুনিয়া ও পরকাল উভয়েরই পুত্র (অনুসারী) আছে। তোমরা পরকালের পুত্র হও, ইহকালের পুত্র হয়ো না। কারণ, শেষ বিচারের দিন প্রত্যেক পুত্র তার মায়ের সাথে থাকবে। আজ হলো আমলের দিন– কোন হিসাব নেওয়া হবে না। আর আগামীকালা হলো হিসাব-নিকাশের দিন– কোন আমল থাকবে না।'[১৮]

এ খুতবায় ইমাম আলী (আ.) শুধু আমাদের কামনা-বাসনার আধিক্যের বিষয়টি উল্লেখ করেননি, সেই সাথে কিভাবে পরকালের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি তাও বলে দিয়েছেন।

আমাদেরকে অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সব ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের আকাঙ্ক্ষার পরিধি সীমিত করতে হবে এবং বিবেক দিয়ে তার ব্যবহার করতে হবে।

আলী (আ.) বলেন : 'যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, তাকে বন্ধু-বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, পরকালে কঠিন হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হতে হবে এবং জানে যে, তার অতীত তাকে সাহায্য করবে না এবং অনুধাবন করে যে, তার সঞ্চয়ের প্রয়োজন, সে তার কামনা-বাসনাকে ছোট করবে এবং ভাল কাজ বৃদ্ধি করবে।'

লোভ

আমাদের জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা কিছু চাহিদা দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি। জীবনের কিছু চাহিদা স্থায়ীভাবে পূরণ করা যায়, আর কিছু চাহিদা আছে যা স্থায়ীভাবে পূরণ করা যায় না। যেমন খাদ্যের চহিদা, বিশ্রামের চাহিদা। আবার মানুষের মনে অনেক চাহিদা রয়েছে যা অত্যাবশকীয় এবং এগুলো পরিবর্তশীল। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে টাকা-পয়সা বা ধনসম্পদ অর্জনে নিয়োজিত হতে হয়। যখন মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায় তখন সে আরো বেশি কিছু আশা করে। ধীরে ধীরে অতিরিক্ত বিষয়ের আশা তাকে লোভাতুর করে তোলে।

হাদীসে আরো এসেছে : 'আদম-সন্তান বৃদ্ধ হয়। কিন্তু তার আশা ও অর্থের মোহ যুবক হতে থাকে।'[১৯]

লোভ মানুষের মনে এমন এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সৃষ্টি করে যা তাকে খুব বেশি বস্তুবাদিতার পেছনে ধাওয়া করতে বাধ্য করে। ফলে তার চিন্তা ও কর্মকাণ্ড একমাত্র বস্তবাদী স্বার্থকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে থাকে। লাগামহীন লোভ হতে বস্তবাদী প্রবণতা জন্ম লাভ করে। ফলে মানুষ সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে সবকিছু উপেক্ষা করে এবং সে সম্পদের সন্ধানে তার নৈতিক গুণাবলী বিসর্জন দিতে থাকে। আলী (আ.) বলেছেন : 'লোভ হচ্ছে খারাপ পথে পরিচালনাকারী একটি প্রেরণা।'[২০]

ড. শফেন হৌর বলেছেন : 'ধনসম্পদ আহরণের প্রতি মানুষের ঝোঁক কতখানি তা নির্ণয় করা বরং কঠিন। কেননা, আত্মতৃপ্তি লাভের ব্যাপারে মানুষে মানুষে পার্থক্য যথেষ্ট। এমন কোন সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই যা দিয়ে মানুষের চাহিদা নির্ণয় করা যেতে পারে। কোন কোন লোক সামান্য পরিমাণ সম্পদ পেয়েই সন্তুষ্ট হয় এবং তা দিয়ে তার চাহিদাসমূহ পূরণ করে। আবার এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যাদের পর্যাপ্ত (যা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি) থাকা সত্ত্বেও তারা অভাব-অনটনের অভিযোগ করে।'[২১]

লোভের কুফল

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'লোভ মানুষকে জালাশয়ের কাছে টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু পানি পান করানো ছাড়াই আবার টেনে ফেরত নিয়ে আসে। লোভ দায়িত্ব গ্রহণ

করে, কিন্তু তা পরিপূর্ণ করে না। লোভাতুর ব্যক্তি তৃষ্ণা মেটার আগেই অনেক সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কোন কিছু পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষা যত বেশি হবে তা না পেলে দুঃখও তত বেশি হবে। লোভ-লালসা বোধগম্যতার চক্ষু অন্ধ করে দেয়।'[২২]...

১. অসন্তুষ্টি : প্রকৃতপক্ষে লোভী ব্যক্তি সমগ্র দুনিয়ার সম্পদ পেলেও কখনও সন্তুষ্ট হবে না। হাদীস এসেছে : 'যদি আদম-সন্তানের দু'টি স্বর্ণের উপত্যকা থাকে, তবে সে এগুলোর পরও তৃতীয়টি চাইবে। মাটিই কেবল মানুষের উদর পূর্তি করে। আর যে তওবা করে, আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন।'[২৩]

রাসূলূল্লাহ (সা.) বলেন : 'দুই লোভী কখনও তৃপ্ত হয় না : জ্ঞানের লোভী ও অর্থের লোভী।'[২৪]

বর্ণিত হয়েছে, জনৈক সম্পদশালী ব্যক্তি এক গ্রীক দার্শনিকের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। তিনি সম্পদশালী লোকটিকে বিশ্বাস করতেন না। তাই তার সাক্ষাৎ উপলক্ষে তেমন কোন বিশেষ আয়োজন করেননি। দার্শনিক ধনী লোকটিকে বললেন : 'আপনি নিশ্চয়ই আমার নিকট থেকে কিছু শেখার জন্য আসেননি, বরং আমার অপেক্ষাকৃত দুর্বল আর্থিক পরিস্থিতির সুযোগে আমাকে খাটো করে দেখার জন্যই এসেছেন। আমি কি ঠিক বলেছি?' ধনী লোকটি বলল : 'আমি যদি জ্ঞানার্জনের পথ অনুসরণ করতাম তাহলে আমার সম্পদ, প্রাসাদ, কর্মচারী ইত্যাদি কিছুই থাকতো না।' দার্শনিক বললেন : 'প্রভূত সম্পদের মালিক না হওয়া সত্ত্বেও আমি আপনার চেয়ে ধনী। আমাকে রক্ষা করার জন্য আমি কোন পাহারাদারের দরকার মনে করি না। কেননা, আমি কায়সারকেও ভয় করি না। আর আপনি যেহেতু অন্যদের ওপর নির্ভরশীল, তাই আপনি সর্বদা গরীব থাকবেন। স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে আমার রয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা, বিচারক্ষমতা, সন্তোষ ও মানসিক তৃপ্তি। আর আপনি অযথা রৌপ্যপাত্রের চিন্তা করে আপনার সময় নষ্ট করছেন। আমার চিন্তা হচ্ছে আমার বিশাল সাম্রাজ্য যেখানে আমি সুখে থাকি। আর আপনি দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষের মধ্যে আপনার গোটা জীবন অতিবাহিত করছেন। আপনি যা কিছুর অধিকারী হয়েছেন এ সবই আমার কাছে অর্থহীন, কিন্তু আমার যা কিছু রয়েছে তা হলো প্রাচুর্য। কেননা, আপনি কখনও আপনার অভাব ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবেন না। কিন্তু আমার সব প্রয়োজনই আমি সর্বদা আমার যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা দিয়ে পূরণ করি।'

২. বিষণ্নতা সৃষ্টি : লোভী ব্যক্তি সবসময় অপরের ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দেয়। তাই যত সম্পদই সে অর্জন করুন না কেন, তার মনে সারাক্ষণ না পাওয়ার দুঃখবোধ কাজ করে। এর ফলে সে ধীরে ধীরে বিষন্নতা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

৩. আত্মিক অগ্রগতির অন্তরায় : লোভ মানুষের আত্মিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়। সর্বক্ষণ ধন-সম্পদের চিন্তায় মানুষের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের ব্যাঘাত ঘটে। সে ধর্মকর্ম ও নৈতিক বিষয়াদি নিয়ে ভাববার মতো মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। আর এতে তার নৈতিকতা ও আত্মিক উন্নতির সুযোগ থাকে না। ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : 'লোভ আত্মাকে অপবিত্র করে, ধর্মকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং যৌবনকে ধ্বংস করে।'[২৫]

৪. অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি : লোভী ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে যে কোন ধরনের অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়। এতে সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। আর তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'লোভ হতে বিরত থাক। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী অনেকেই লোভের কারণে ধ্বংস হয়েছে। লোভ তাদেরকে কার্পণ্যপূর্ণ আচরণের অধিকারী হতে বলেছে এবং তারা তা-ই করেছে। এটা তাদেরকে অপরাধ করতে বলেছে এবং তারা তাই পাপী হয়েছে।'[২৬]

ইমাম আলী (আ.) লোভ হতে যে দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে বলেছেন : 'লোভ পরিহার কর। কেননা, এর অধিকারী ব্যক্তি পাপ ও শ্রান্তির হাতে বন্দী।'[২৭]

তিনি আরো বলেছেন : 'একজন লোভী ব্যক্তি অপরাধের হাতে বন্দী। তার এ বন্দীদশা কখনও শেষ হবে না।'[২৮]

৫. হতাশা সৃষ্টি : লোভী ব্যক্তি তার সম্পদকে তার বংশধর ও তার বিপদময় জীবনের জন্য সংরক্ষিত বস্তু বলে মনে করে। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে সে দুঃখ ও হতাশার সাথে তার সম্পদের প্রতি তাকায়। সে এ কথা চিন্তা করতে থাকে যে, এ সম্পদ তার কবরে কোন কাজে আসবে না। সে তার জীবনব্যাপী যে সব ভুল করেছে তার জন্য সে আজ তার কবরে দুঃখই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ইমাম বাকের (আ.) লোভী ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন : 'এ দুনিয়ায় লোভী ব্যক্তিদের উদাহরণ রেশম গুটির মতো। যত বেশি রেশমী সুতা সে তার গায়ের চতুর্দিকে বোনে,

তত কম সুযোগই সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য পেয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ে।'[২৯]

৬. অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি : লোভী ব্যক্তিরা তাদের লোভের পথে পা বাড়াতে গিয়ে এমন সব অন্যায় পথে পা বাড়াতে থাকে যা অনেক সময় অন্যদের দারিদ্র্যের কারণ হয়ে যায়। সে লোভের বশবর্তী হয়ে অধিক সম্পদ আহরণ করার আশায় সম্পদের উৎসমূল দখল করে। এর পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৭. অনৈক্য সৃষ্টি : যখন লোভ একটি জাতিকে পেয়ে বসে, তখন তা ঐ জাতির গোটা সামাজিক জীবনকে দৃঢ়তা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের পরিবর্তে পারস্পরিক বিবাদ ও অনৈক্যে পরিবর্তিত করে।

৮. পরকালীন শাস্তি : লোভের কারণে যেহেতু সে অনেক অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে, তাই পরকালে এজন্য তাকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। আর এ শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নেই।[৩০]

অল্পে তুষ্টি

লোভের বিপরীতে হলো অল্পে তুষ্টি। যুক্তিবাদী ব্যক্তিরা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রাপ্তিতেই তুষ্ট থাকে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'সেই ব্যক্তির জন্য মোবারকবাদ, যাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করা হয়, যার জীবিকা জীবন ধারণ পরিমাণে সীমিত হয় এবং তাতেই তুষ্ট থাকে।'[৩১]

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : 'সন্তোষ ও খোদাভীরুতার পথের অনুসরণ সর্বোত্তম। লোভ ও অন্যায় লালসা হতে নিজের আত্মাকে মুক্ত করা উচিত। কেননা, লোভ ও অর্থলিপ্সা হচ্ছে বর্তমান দারিদ্র্য। আর সন্তোষ ও আত্মসমর্পণ হচ্ছে স্পষ্টতার প্রতীয়মান সম্পদ।'[৩২]

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী হতে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুইন রাসুলূল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট এসে বলল : 'আমাকে সংক্ষিপ্ত কোন উপদেশ দিন।' তিনি বললেন :

'বিদায়ী ব্যক্তির মতো নামায পড়। এমন কথা বলো না যার জন্য আগামীকাল ওযর পেশ করতে হয়। আর অন্যের হাতে যা আছে তার প্রতি আশা করো না।'[৩৩]

বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আ.) মহান আল্লাহ্কে প্রশ্ন করলেন : 'ইয়া ইলাহী! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে অধিক ধনী?' এরশাদ হলো : 'যে আমার দানে অধিকতর তুষ্ট থাকে।' আবার প্রশ্ন করা হলো : 'অধিক ন্যায়পরায়ন কে?' উত্তর হলো : 'যে নিজের সাথে ইনসাফ করে।'[৩৪]

অল্পে তৃষ্টির উপকারিতা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'পরহেজগারী অবলম্বন কর, সকলের চেয়ে অধিক ইবাদতকারী হয়ে যাবে। অল্পে সন্তুষ্ট থাক, সকলের মধ্যে অধিক শোকরকারী হয়ে যাবে। অন্যের জন্য তা-ই কামনা কর যা তোমার নিজের জন্য কামনা করে থাক। এতে ঈমানদার হয়ে যাবে।'[৩৫]

আলী (আ.) বলেন : 'পরিতৃপ্তি এমন এক সম্পদ যা কখনো শেষ হয় না।'[৩৬]

অল্পে তুষ্টি লাভের উপায়

১. মধ্যবর্তীতা অবলম্বন ও মিতব্যয়িতা : যে বক্তি অল্পে তুষ্ট থাকতে চায় সে যেন যথাসম্ভব খরচের দ্বার বন্ধ রাখে। কেননা, যার ব্যয়ের মাত্রা বেশি হবে, সে অল্পে তুষ্ট হতে পারবে না। হাদীসে এসেছে : 'যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, সে দরিদ্র হয় না।' হাদীসে আরো আছে : 'উদ্ধারকারী বিষয় তিনটি : গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্কে ভয় করা, ধনাঢ্যতায় ও দারিদ্র্যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা এবং সন্তুষ্টি ও ক্রোধের অবস্থায় ন্যায়বিচার করা।'[৩৭]

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'যে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তাকে ধনী করেন। যে অপব্যয় করে, আল্লাহ্ তাকে ফকির করে দেন। আর যে আল্লাহ্কে স্মরণ করে, আল্লাহ্ তাকে প্রিয় করে নেন।'[৩৮]

২. ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির না হওয়া : পরিমিত ধন-সম্পদ হাতে থাকলে ভবিষ্যতের জন্য অস্থির হওয়া উচিত নয়। আসলে লোভ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান তার মনে এটা জাগ্রত করে যে, বেশি ব্যয় করলে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সঞ্চয় না করলে অসুস্থতা ও অক্ষমতার সময় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে। সে এভাবে মানুষকে অর্থ উপার্জনের কষ্টে নিয়োজিত করে। এরপর সে নিজের কাজ দেখে হাসে যে, দেখ, ভবিষ্যতের কষ্টের আকাঙ্ক্ষায় বর্তমানে কেমন কষ্ট করে যাচ্ছে! এটা কিরূপে জানা গেল যে, ভবিষ্যতে কষ্ট অবশ্যই হবে। কিছুই তো না হতে পারে।

আল্লাহ্ যতটুকু দিয়েছেন সেটাতে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর বেশি বেশি কামনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

'যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দেন যা সে ধারণাও করতে পারে না।'[৩৯]

৩. মুখাপেক্ষিতা থেকে দূরে থাকা : অল্পে তুষ্ট থাকলে মানুষ অমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে পারে– এ বিষয়টি মানুষ অনুধাবন করতে পারলে সে অল্পে তুষ্ট থাকতে পারবে।

৪. মুত্তাকীদের পথ অবলম্বন : নবী-রাসূল এবং ইমামগণের জীবন এবং ধন-সম্পদশালীদের জীবনের মধ্যে কোন্ জীবন প্রণালী সে বেছে নেবে? তাদের জন্য চূড়ান্ত ভাল রয়েছে কোন্ জীবন প্রণালীর মধ্যে তা বুঝতে হবে।

৫. কম অবস্থাসম্পন্নদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু যারকে অসিয়ত করেছিলেন : 'দুনিয়াতে তোমার চেয়ে কম অবস্থাপন্ন যারা তাদের প্রতি দেখবে, যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো তাদের দিকে নজর দিবে না।'

অল্পে তুষ্টির কল্যাণ

১. সুখবোধ : লোভী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর মনোকষ্ট আর কাউকে সহ্য করতে হয় না। অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবন আর কেউ যাপন করতে পারে না। সক্রেটিস বলেছেন : 'বহু লোকের অর্থ, মূল্যবান রত্ন, সুন্দর পোশাকাদি,

প্রাসাদ ইত্যাদি কিছুই থাকে না, তথাপি তাদের জীবন সম্পদশালী লোকের জীবনের চেয়ে সহস্র গুণ সুখী।'[৪০]

২. বাস্তববাদী হওয়া : অল্পে তুষ্ট ব্যক্তি বাস্তববাদী হয়। সে তার যোগ্যতা অনুযায়ী সবকিছু কল্পনা করে। অন্যদিকে লোভী ব্যক্তি লোভের কারণে তার যোগ্যতাকে ভুলে যায় এবং বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। হযরত শা'বী (র.) একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি একটি খঞ্জনা পাখি ধরলে পাখিটি তাকে জিজ্ঞেস করল : 'হে মানব! তোমার ইচ্ছা কী?' লোকটি বর্ণনা করল : 'তোমাকে জবাই করে ভক্ষণ করাই আমার ইচ্ছা।' পাখিটি বলল : 'আমার মতো এত ক্ষুদ্র পাখির মাংস ভক্ষণ করলে তোমার কিছুই তৃপ্তি হবে না। আমি তোমাকে এমন তিনটি কথা শিখিয়ে দিতে পারি যা আমার মতো এত ক্ষুদ্র পাখির মাংস ভক্ষণ করার চেয়ে তোমার জন্য অধিক লাভজনক হবে। প্রথম কথা তোমার হাতে থেকেই বলব। দ্বিতীয় কথা গাছের ডালের ওপর গিয়ে বলব। আর তৃতীয় কথা সেখান থেকে উড়ে পর্বতের দিকে যাবার সময় বলব।' লোকটি এতে সম্মত হলো। পাখিটি হাতের ওপর থেকেই প্রথম কথাটি বলল : 'তোমার হাত থেকে কোন কিছু চলে গেলে তার জন্য আফসোস করো না।' এ কথা বলে পাখিটি উড়ে গিয়ে গাছের ডালের ওপর বসল। লোকটি বলল : 'এবার তোমার দ্বিতীয় কথাটি শোনাও।' পাখি বলল : 'অসম্ভব কথা বিশ্বাস করো না।' এ কথা বলে পাখি উড়ে গিয়ে পর্বতে বসল আর বলতে লাগল : 'তোমার কোন অভাবই থাকত না। আমার পেটে বিশ তোলা ওজনের দু'টি মানিক রয়েছে, তা পেলে তুমি আর কখনো গরীব হতে না।' এ কথা শুনে লোকটি নিতান্ত দুঃখিত মনে দাঁতে আঙ্গুল কেটে অনুতাপ করতে লাগল এবং বলল : 'হে খঞ্জনা! এখন তোমার তৃতীয় কথাটি বল।' এ কথা শুনে খঞ্জনা বলল : 'তুমি আমার পূর্বে কথিত দু'টি কথাই ভুলে গেছ, তৃতীয় কথা শুনে কি করবে? আমি তোমাকে বলেছিলাম : যা তোমার হাত থেকে চলে যাবে তার জন্য অনুতাপ করবে না এবং অসম্ভব কথায় বিশ্বাস করো না। তুমি তো আমাকে ইচ্ছা করেই ছেড়ে দিয়েছ। তবে এখন কেন অনুতাপ করছ? আমি তো তোমার হাতে অনেকক্ষণ ধরে ছিলাম। তুমি আমাকে নেড়ে চেড়ে আমার ওজন কতটুকু হতে পারে তা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ। সমস্ত দেহ, মাংস, চর্ম, পালক সব সহ দশ তোলাও হবে না। এটা নিশ্চয়ই অনুমান করেছ। তবে এখন কেমন করে

বিশ্বাস করলে যে, বিশ তোলা ওজনের দু'টি মানিক আমার পেটের মধ্যে আছে?' এ বলে পাখিটি উড়ে গেল। এ গল্প বলার উদ্দেশ্য হলো : মানুষের অন্তরে লোভ প্রবেশ করলে সে সমস্ত অসম্ভব বিষয়কেই বিশ্বাস করে।

২. আত্মসম্মান বজায় থাকা : অল্পে তুষ্ট থাকলে মানুষের মুখাপেক্ষী হতে হয় না। এতে মানুষের আত্মসম্মান বজায় থাকে। অন্যথায় মানুষের সামনে হেয় হতে হয়। ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) বলেছেন : 'অপরের কাছে সাহায্য চাওয়া জীবনে অপমানের কারণ হয়...।'[৪১]

(চলবে)

তথ্যসূত্র

১. সূরা বাকারা : ৮৯

২. মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬

৩. বিহারুল আনওয়ার, ৭৩তম খণ্ড, অধ্যায় ১৩১, হাদীস নং ২৩

৪. গুরারুল হিকাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০

৫. বিহারুল আনওয়ার, অধ্যায় ৯৯, হাদীস নং ১

৬. মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩

৭. মুসতাদরাক, ১২তম খণ্ড, অধ্যায় ৫৫, হাদীস নং ১৩৪০১

৮. মুসতাদরাক, ১২তম খণ্ড, অধ্যায় ৫৫, হাদীস নং ১৩৪০০

৯. গুরার আল হিকাম, পৃ. ৩২

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

১১. গুরারুল হিকাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১

১২. বিহারুল আনওয়ার, ৭৩তম খণ্ড, অধ্যায় ১৩১

১৩. মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৭

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

১৫. গুরারুল হিকাম, পৃ. ৩৫৫

১৬. সাফীনাতুল বিহার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০

১৭. সাফীনাতুল বিহার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০

১৮. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ৪২, পৃ. ৬৮

১৯. মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩

২০. গুরারুল হিকাম, পৃ. ১৬

২১. আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনের কর্মপন্থা, পৃ. ১৭৪

২২. নাহ্জ আল-বালাঘা, বাণী নং ২৮৫

২৩. মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮২

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২

২৫. গুরার, পৃ. ৭৭

২৬. নাহযুল ফাসাহা, পৃ. ১৯১

২৭. গুরারুল হিকাম, পৃ. ১৩৫

২৮. ঐ, পৃ.৫০

২৯. ৩০. উসুলূল কাফী, ২য় খণ্ড

৩০. মুসতাদরাকুল ওয়াসায়িল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৫

৩১. মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩

৩২. গুরারুল হিকাম, পৃ. ৫৪৪

৩৩. মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৩

৩৪. মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩

৩৬. নাহ্‌জ আল-বালাঘা, সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভমূলক বাণী নং ৪৮৬

৩৭. মদীনা পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত, এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮৫

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৬

৪০. আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনের কর্মপন্থা, পৃ. ১৭৪

৪১. বিহারুল আনওয়ার, ৭৮তম খণ্ড, পৃ. ১৩৬

বিশেষ নিবন্ধ

পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসে হযরত আলী (আ.)

১০০

পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসে হযরত আলী (আ.)

মিকদাদ আহমেদ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তরাধিকারী, তাঁর নবুওয়াতের মিশনের প্রধান সাহায্যকারী এবং দুনিয়া ও আখেরাতে রাসূলের ভ্রাতা আলী (আ.) আবরাহার পবিত্র মক্কা আক্রমণের ৩৩ বছর পর ১৩ রজব পবিত্র কা'বা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। মহান আল্লাহ্র আদেশে তাঁর নাম রাখা হয় আলী।

শিশুকাল থেকেই মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আলীর বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কে আলী (আ.) নিজেই বলেছেন : '...তিনি আমাকে তাঁর কোলে রাখতেন যখন আমি শিশু ছিলাম। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং তাঁর বিছানায় শুইয়ে রাখতেন। তাঁর পবিত্র দেহ আমার দেহকে স্পর্শ করত এবং তিনি আমাকে তাঁর শরীরের সুগন্ধির ঘ্রাণ নেওয়াতেন। তিনি খাদ্য-দ্রব্য চিবিয়ে আমার মুখে পুরে দিতেন।...'[১]

হযরত আবু তালিবের সংসারের ব্যয়ভার কমানোর জন্য হযরত আলীর বালক বয়সেই মহানবী (সা.) তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। তখন থেকে তিনি রাসূলের সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে যান। রাসূল হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহ্র ইবাদাত করতে গেলেও তাঁকে সাথে নিয়ে যেতেন। হযরত আলী বলেন : 'তিনি (মহানবী) প্রতি বছর হেরাগুহায় একান্ত নির্জনে বাস করতেন। আমি তাঁকে দেখতাম। আমি ব্যতীত আর কোন লোকই তাঁকে দেখতে পেত না। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ ও খাদীজাহ্ ব্যতীত কোন মুসলিম পরিবারই পৃথিবীর বুকে ছিল না। আমি ছিলাম তাঁদের পরিবারের তৃতীয় সদস্য। আমি ওহী ও রেসালতের আলো প্রত্যক্ষ করেছি এবং নবুওয়াতের সুবাস ও সুঘ্রাণ অনুভব করেছি।'[২]

তিনি মহানবীর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করতেন। তিনি বলেন : 'উষ্ট্র শাবক যেমনভাবে উষ্ট্রীকে অনুসরণ করে ঠিক সেভাবে আমি তাঁকে অনুসরণ করতাম। তিনি প্রতিদিন তাঁর উন্নত চরিত্র থেকে একটি নিদর্শন আমাকে শিক্ষা দিতেন এবং আমাকে তা পালন করার নির্দেশ দিতেন।... তাঁর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তখন আমি শয়তানের ক্রন্দন ধ্বনি শুনেছিলাম। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম : হে রাসূলুল্লাহ্! এ ক্রন্দন ধ্বনি কার? তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন : এই শয়তান এখন থেকে তার পূজা (ইবাদাত) করা হবে না বলে হতাশ হয়ে গেছে। নিশ্চয় আমি যা শুনি তুমি তা শোন এবং আমি যা দেখি তা দেখ। তবে তুমি নবী নও, কিন্তু [নবীর] সহকারী এবং নিঃসন্দেহে তুমি মঙ্গল ও কল্যাণের ওপরই আছ।'[৩]

আর তাই মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসার পর তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর ওপর ঈমান আনেন এবং তিনিই তাঁর সাথে নামায আদায় করা প্রথম ব্যক্তি। ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন : 'মহানবী (সা.) সোমবারে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং আলী মঙ্গলবারে তাঁর ওপর ঈমান আনেন।'[৪]

হযরত আলী নিজেই বলেন : 'আমি আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁর রাসূলের ভ্রাতা এবং তাঁর নবুওয়াতের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসস্থাপনকারী। একমাত্র মিথ্যাবাদী ছাড়া আমার পর কেউ এ দাবি করবে না। অন্য লোকদের নামায পড়ারও ৭ বছর আগে থেকে আমি নামায পড়েছি।'[৫]

হযরত আলী (আ.)-এর প্রসিদ্ধ উপাধি

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আলীকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে সিদ্দিকে আকবার, ফারুকে আযম, আসাদুল্লাহ্ ও মুরতাজা।

পবিত্র কুরআনে হযরত আলী (আ.)-এর মর্যাদা

হযরত আলীর শানে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কোন ব্যক্তির গুণ বর্ণনায়

এত অধিক কুরআনের বাণী অবতীর্ণ হয়নি যা হযরত আলী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস আরও বলেছেন যে, হযরত আলীর শানে তিনশ' আয়াত নাযিল হয়েছে এবং তাঁর গুণাবলি অত্যধিক ও প্রসিদ্ধ।[৬] পবিত্র কুরআনের নাযিলকৃত আয়াতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১. সূরা বাকারার ২০৭ নং আয়াত

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ

'এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রয় করে দেয় এবং আল্লাহ (এরূপ) বান্দাদের প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।'

সালাবী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিলেন সেই সময় হযরত আলীকে তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকার নির্দেশ দেন যাতে কাফির-মুশরিকরা মনে করে যে, রাসূল তাঁর নিজ ঘরেই রয়েছেন। আলী (আ.) নির্দ্বিধায় এ নির্দেশ পালন করলে মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন।[৭]

২. সূরা আলে ইমরানের ৬১ নং আয়াত

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

'অতঃপর তোমার নিকট যখন জ্ঞান (কুরআন) এসে গেছে, এরপরও যদি কেউ (খ্রিস্টান) তোমার সাথে তার (ঈসার) সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে, তবে বল, '(ময়দানে) এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদের ও তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের এবং আমাদের সত্তাদের ও তোমাদের সত্তাদের;' অতঃপর সকলে মিলে (আল্লাহর দরবারে) নিবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষণ করি।'

ঘটনাটি এরূপ : রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুওয়াতের সত্যতা যাচাই করার জন্য নাজরানের একটি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদল মদীনায় আসল। তাদের সাথে আলোচনা ফলপ্রসূ হলো না। রাসূল (সা.) হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে প্রতিনিধিদের বললেন যে, তিনি আল্লাহ্র পুত্র নন, বরং আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ হযরত ঈসার জন্মের ব্যাপারে হযরত আদমের উদাহরণও দিলেন। কিন্তু তারা কোন কথাই শুনল না। অবশেষে তিনি আল্লাহর আদেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে দোয়া ও মিথ্যাবাদীদের ওপর অভিশাপ বর্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যাকে 'মুবাহিলা' বলে। স্থির করা হল যে, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে উভয়ে নিজ নিজ পুত্রদের, নারীদের (কন্যা সন্তানদের) এবং তাদের নিজেদের 'সত্তা' বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একত্র হবে এবং প্রত্যেকে অপরের প্রতি অভিসম্পাত ও আল্লাহর শাস্তি কামনা করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইমাম হুসাইনকে কোলে নিয়ে ইমাম হাসানের হাত ধরলেন এবং হযরত ফাতিমাকে নিজের পেছনে, আর হযরত আলীকে তাঁর পেছনে রাখলেন। অর্থাৎ ছেলেদের স্থানে তিনি নাতিদের, নারীদের স্থানে নিজ কন্যাকে এবং 'সত্তা' বলে গণ্যদের স্থানে আলীকে নিলেন এবং দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! প্রত্যেক নবীর আহলে বাইত থাকে, এরা আমার আহলে বাইত। এদের সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত ও পাক-পবিত্র রেখ।' তিনি এভাবে ময়দানে পৌঁছলে খ্রিস্টানদের নেতা আকব তা দেখে বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি এমন নূরানী চেহারা দেখছি যে, যদি এ পাহাড়কে নিজ স্থান হতে সরে যেতে বলেন, তবে অবশ্যই সরে যাবে। সুতরাং মুবাহিলা হতে হাত গুটিয়ে নেওয়াই কল্যাণকর, অন্যথায় কিয়ামত অবধি খ্রিস্টানদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।' পরিশেষে তারা জিযিরা কর দিতে সম্মত হল। এটা হযরত আলীর একটি উঁচু স্তরের ফযিলত যে, তিনি আল্লাহর আদেশে রাসূলের 'নাফ্স' (অনুরূপ সত্তা) সাব্যস্ত হলেন এবং সমুদয় নবীর থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন।[৮]

৩. সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

'হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল ও তোমাদের মধ্যে যারা নির্দেশের অধিকর্তা, তাদের আনুগত্য কর...।'

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)- কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, উত্তরাধিকারীর আদেশ মান্য করা কি অবশ্যই কর্তব্য? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তাঁরা ঐসব ব্যক্তি যাঁদের আদেশ পালন করা এ আয়াতে ওয়াজিব করা হয়েছে...। এ আয়াত হযরত আলী বিন আবি তালিব, হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (আ.)-এর শানে অবতীর্ণ হয়েছে।[৯]

৪. সূরা মায়েদার ৫৫ নং আয়াত

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾

'(হে বিশ্বাসিগণ!) তোমাদের অভিভাবক তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং সেই বিশ্বাসীরা যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং রুকু অবস্থায় যাকাত প্রদান করে।'

শীয়া-সুন্নি উভয় মাযহাবের তফসীরকাররা একমত যে, আয়াতটি হযরত আলী (আ.)-এর শানে নাযিল হয়েছে। যেমন ইবনে মারদুইয়া এবং খাতীব বাগদাদী ইবনে আব্বাস সূত্রে এবং তাবরানী ও ইবনে মারদুইয়া আম্মার ইবনে ইয়াসির ও আলী ইবনে আবি তালিব সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটি আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যখন তিনি রুকু অবস্থায় যাকাত দেন।

ঘটনাটি এরূপ : একদিন হযরত আলী (আ.) মদীনার মসজিদে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় একজন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। কিন্তু কোন ভিক্ষা না পাওয়ায় সে ফরিয়াদ করল যে, রাসূলের মসজিদ থেকে সে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে। এ সময় হযরত আলী রুকু অবস্থায় ছিলেন। তিনি সেই অবস্থায় তাঁর ডান হাতের আঙ্গুল থেকে আংটি খুলে নেওয়ার জন্য ভিক্ষুকের প্রতি ইশারা করেন। ভিক্ষুক তাঁর হাত থেকে আংটি খুলে নেয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হয়।[১০]

৫. সূরা মায়েদার ৬৭ নং আয়াত

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ﴿٦٧﴾

'হে রাসূল! যা (যে আদেশ) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দাও, আর যদি তুমি তা না কর, তবে তুমি (যেন) তার কোন বার্তাই পৌঁছাওনি, এবং (তুমি ভয় কর না) আল্লাহ তোমাকে মানুষের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন; এবং নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।'

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) দশম হিজরিতে বিদায় হজ্ব থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। ইবনে আবী হাতিম ও ইবনে আসাকির আবু সাঈদ খুদরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত গাদীরে খুম প্রান্তরে হযরত আলী (আ.)-এর শানে নাযিল হয়েছে।

বিদায় হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করার সময় গাদীরে খুম নামক স্থানে মহানবী (সা.) হযরত আলীকে তাঁর পরে সকল মুমিনের অভিভাবক বলে ঘোষণা দেন।[১১]

এ ঘোষণা দেয়ার পর হযরত ওমর হযরত আলীর সাথে সাক্ষাৎ করে অভিনন্দন জানান এবং বলেন : 'হে আলী ইবনে আবি তালিব! আপনি আজ হতে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর মাওলা হয়ে গেলেন।'[১২]

৬. সূরা রাদের ৭ নং আয়াত

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

'(হে রাসূল!) তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে এক পথ প্রদর্শক।'

ইবনে মারদুইয়্যা, ইবনে জারীর, আবু নাঈম তাঁর 'মারেফাত' গ্রন্থে, ইবনে আসাকির, দাইলামী ও ইবনে নাজ্জার তাঁদের স্ব স্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটি নাযিল হলে মহানবী (সা.) তাঁর হাত নিজের বুকে রেখে বললেন, 'আমিই সতর্ককারী।' অতঃপর আলীর কাঁধের প্রতি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, 'হে আলী! তুমিই পথপ্রদর্শক এবং মানুষ আমার পর তোমার মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।' উক্ত রেওয়ায়েতটি শব্দের তারতম্যে ইবনে মারদুইয়্যা সাহাবী আবু বারযাহ আসলামী হতে, জীয়াফীল হযরত ইবনে আব্বাস হতে, ইবনে আহমাদ তাঁর মুসনাদে এবং ইবনে মারদুইয়্যা ও ইবনে আসাকির স্বয়ং হযরত আলী (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন।[১৩]

৭. সূরা রাদের ৪৩ নং আয়াত

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِتَٰبِ ﴿٤٣﴾

যারা অবিশ্বাস করেছে তারা বলে, 'তুমি আল্লাহর রাসূল নও।' তুমি বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে (রেসালাতের) সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সেই ব্যক্তি যার কাছে গ্রন্থের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে।'

অধিকাংশ তাফসীরকার স্বীকার করেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত সেই ব্যক্তি হলেন হযরত আলী (আ.)। যেমন আসমী 'যায়নুল ফাতা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং সা'লাবী আবদুল্লাহ ইবনে আতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন সালাম বলতেন, 'যার কাছে গ্রন্থের পূর্ণ জ্ঞান আছে'-এর উদ্দিষ্ট হযরত আলী (আ.)। এজন্যই হযরত আলী (আ.) বারবার বলতেন, 'আমার কাছে আমার মৃত্যুর পূর্বে যা চাও জিজ্ঞেস কর।'[১৪]

৮. সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াত

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۚ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣

তোমার পূর্বেও আমরা কেবল পুরুষদেরই (রাসূল করে) প্রেরণ করেছি যাদের প্রতি আমরা প্রত্যাদেশ প্রেরণ করতাম; যদি তোমরা না জেনে থাক তবে যারা জানে তাদের জিজ্ঞেস কর।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন : জ্ঞানী ব্যক্তিরা অর্থাৎ আহলুয যিক্‌র হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.), হযরত আলী (আ.), হযরত ফাতেমা (আ.), হযরত হাসান ও হুসাইন (আ.)। যাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন : যখন এই আয়াত নাযিল হল তখন হযরত আলী বললেন : আমরাই হলাম জ্ঞানের ভাণ্ডার।[১৫]

৯. সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াত

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣

'হে নবী পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামার ঘরে এ আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (আ.)-কে ডাকেন এবং তাঁদেরকে একটি চাদরে ঢেকে নেন। হযরত আলী তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি তাঁকেও চাদরে ঢেকে নেন। অতঃপর বলেন : 'হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত। অতএব, তুমি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং তাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র কর।' তখন উম্মে সালামা বলেন : 'হে আল্লাহর রাসূল! আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত?' তিনি বলেন : 'তুমি স্ব স্থানে আছ এবং তুমি কল্যাণের মধ্যেই আছ।'[১৬]

হযরত উম্মে সালামা ছাড়াও হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আনাস ইবনে মালিক কর্তৃক এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।[১৭]

১০. সূরা শূরার ২৩ নং আয়াত

ذَٰلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

'বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট থেকে আমার নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালবাসা ছাড়া আর কোন প্রতিদান চাই না।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকটাত্মীয় আহলে বাইতের সদস্যদের প্রতি ভালবাসা পোষণকে এ আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ্ মুসলমানদের জন্য ফরয বলে ঘোষণা করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন : যখন এ আয়াত নাযিল হল তখন সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূলুল্লাহ! আপনার নিকটাত্মীয়, যাদেরকে ভালবাসা আমাদের ওপর ওয়াজিব করা হয়েছে তারা কারা? রাসূল (সা.) বললেন : আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন।[১৮]

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসে আলী (আ.)

হযরত আলীর মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

১. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বলেন, নবী (সা.) তাবুক যুদ্ধের সময় আলীকে লক্ষ্য করে বলেছেন : 'তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মর্যাদার দিক থেকে মূসার নিকট হারুন যে পর্যায়ে ছিলেন, তুমিও আমার নিকট ঐ পর্যায়ে রয়েছ?'[১৯]

২. অন্য একটি হাদীসে এসেছে : রাসূল বলেন : 'তুমি তো আমার নিকট তদ্রূপ যেরূপ হারুনের স্থান মূসার নিকট। পার্থক্য এতটুকু যে, আমার পরে কোন নবী নেই।'[২০]

৩. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমাম হাসান ও হুসাইনের হাত ধরে বলেন : 'যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে এবং এ দু'জন ও তাদের পিতা-মাতাকে ভালবাসে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে একই মর্যাদায় অবস্থান করবে।'[২১]

৪. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। রাসূল বলেছেন : 'আলীর চেহারার দিকে তাকানোও ইবাদত।'[২২]

৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলী (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন : 'মুমিনরাই তোমাকে মহব্বত করবে এবং মুনাফিকরাই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।'[২৩]

৬. তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাযাহ হুবশী ইবনে জুনাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (সা.) বলেছেন : 'আলী আমা থেকে এবং আমি আলী থেকে। যে ব্যক্তি আলীকে ভালবেসেছে, সে আমাকে ভালোবেসেছে। আর যে ব্যক্তি আলীকে ভালবেসেছে, সে আল্লাহকে ভালবেসেছে। যে ব্যক্তি আলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। আর যে আমার শত্রু সে আল্লাহ্র শত্রু। যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দিয়েছে, সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে।'[২৪]

৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : '(হে আলী!) দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমারই ভাই।'[২৫]

৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরাইদা (র.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'চার ব্যক্তিকে ভালবাসতে আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন এবং তিনি আমাকে এও অবহিত করেছেন যে, তিনিও তাদের ভালবাসেন। বলা হল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের তাদের নামগুলো বলুন। তিনি বলেন :

আলীও তাদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। (অবশিষ্ট তিনজন হলেন) আবু যার, মিকদাদ ও সালমান।...'[২৬]

৯. জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : তায়েফ অভিযানের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আলীকে কাছে ডেকে তার সাথে চুপিসারে আলাপ করেন। লোকেরা বলল : তিনি তাঁর চাচাত ভাইয়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ চুপিসারে কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন : আমি তার সাথে চুপিসারে কথা বলিনি; বরং আল্লাহ্ই তার সাথে চুপিসারে কথা বলেছেন। (অর্থাৎ তার সাথে চুপিসারে কথা বলার জন্য আল্লাহ্ই আমাকে আদেশ করেছেন।)[২৭]

হযরত আলী সম্পর্কে অন্যান্য সাহাবী

হযরত আবু বকর প্রায়ই হয়রত আলীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। হযরত আয়েশা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন : 'আমি রাসূলে করীমকে বলতে শুনেছি, আলীর মুখ দেখা ইবাদাতের শামিল।'[২৮]

হযরত উমর বিন খাত্তাব বলতেন, হযরত আলী বিন আবি তালিবের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যদি তার একটি আমার থাকত তাহলে আমি বলতাম যে, আমাকে লাল রঙের একটি উট দেয়া হলে তা অপেক্ষাও আমি তা পছন্দ করতাম। তাঁকে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তাঁর বিয়ে হয় রাসূল (সা.)-এর কন্যার সাথে, ২. তাঁর সঙ্গে রাসূলে করীমের মসজিদে অবস্থান এবং যা রাসূলে করিমের জন্য বৈধ ছিল তার জন্যও তা বৈধ ছিল এবং ৩. খায়বার যুদ্ধের পতাকা বহনের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল।[২৯]

হযরত উমর বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমার ওপর এমন কোন বিপদ দিও না যখন আবুল হাসান (আলী) আমার নিকট উপস্থিত না থাকে। কারণ, তিনি আমার নিকট উপস্থিত থাকলে আমাকে সে বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দেবেন।'[৩০]

তাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, হযরত আলীর আঠারটি বৈশিষ্ট্য এমন ছিল যা সমগ্র উম্মতের কারও ছিল না।'[৩১]

তথ্যসূত্র

১. মমতাজ বেগম কর্তৃক প্রকাশিত নাহজ আল বালাঘা, ২য় মুদ্রণ, আল খুতবাতুল কাসেয়াহ্, খুতবা নং ১৯১

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. মুসতাদরাকে হাকেম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২; এটি ইমাম মালেক কর্তৃক বর্ণিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেরা গুহায় জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুওয়াত ঘোষণার পর পরই হযরত আলী (আ.) তাঁর ঈমান আনার বিষয়টি প্রকাশ করেন।

৫. সুনানে ইবনে মাজাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪

৬. নূর-এ-সাকালাইন কর্তৃক প্রকাশিত, সাইয়্যেদ আলী জাফরী প্রণীত আল মুরতাজা, পৃ. ৩০

৭. এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮; নুরুল আবসার, পৃ. ৮৬, মুসতাদরাকে হাকেম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪; তাফসীরে কুমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১; তাযকিরাতু সিবতে ইবনে যাওযী, পৃ. ২১; ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ্, পৃ. ৯২

৮. তাফসীরে জালালাইন, ১ম খণ্ড, পৃ.৬০; বায়দ্বাভী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮, তাফসীরে দুররুল মানসুর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯, মিশর মুদ্রণ; মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫;

৯. মাজমাউল বায়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; তাফসীরে কুমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১; ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ, পৃ. ২১; শাওয়াহেদুত তানযিল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮; তাফসীরে ফুরাত, পৃ. ২৮

১০. তাফসীরে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৫; তাফসীরে রাযী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩১; মানাকেবে খাওয়ারেযমী, পৃ. ১৭৮; যাখায়েরুল উকবা, পৃ. ১০২; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭১; আল- বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৭; সাওয়ায়েকে মুহরিকাহ, পৃ. ২৫;

১১. মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭২; ইমাম নাসাঈ প্রণীত খাসায়েসে আমীরুল মুমিনীন, পৃ. ২১; মুসতাদরাকে হাকেম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯; আল গাদীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪ ও ২২৯; শাওয়াহেদুত তানযিল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭

১২. তাফসীরে তাবারী, ৩য় খণ্ড, মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, ৩য় খণ্ড, দারে কুতনী

১৩. তাফসীরে দুররে মানসুর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৫ দ্রষ্টব্য

১৪. তাফসীরে দুররে মানসুর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৯

১৫. কেফাইয়াতুল মুওয়াহহিদীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৫০; মাজমাউল বায়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৬; তাফসীরে তাবারী, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ১০৮

১৬. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৭২৫, পৃ. ৩৫৯

১৭. মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১; যাখায়েরুল উকবা, পৃ. ২১, তাফসীরে তাবারী, ২২তম খণ্ড, পৃ. ৮; মুসতাদরাকে হাকেম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮; ফাজায়েলে খামসাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪; শাওয়াহেদুত তানযিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০

১৮. যাখায়েরুল উকবা, পৃ. ৯ ও ১২; তাফসীরে যামাখশারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; সাওয়ায়েকে মুহরিকাহ, পৃ. ১০১, তাফসীরে দুররুল মানসূর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭; মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯; আল গাদীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭২; শাওয়াহেদুত তানযিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০

১৯. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নং ৩৪৩১; বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০৪২

২০. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০৪০ ও জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৬৮

২১. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৭০

২২. এমদাদীয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.), পৃ. ১৫

২৩. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৭৩

২৪. এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হযরত আলী (রা.), পৃ. ১৫-১৬

২৫. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৫৮;

২৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৫৬;

২৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৬৪

২৮. সাওয়ায়েকে মুহরিকাহ, পৃ. ১৭৫

২৯. সাওয়ায়েকে মুহরিকাহ, ৩য় খণ্ড, এবং মুসতাদরাকে হাকেম, ৩য় খণ্ড

৩০. মুনতাখাবে কানজুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড

৩১. সাওয়ায়েকে মুহরিকাহ

দর্শন ও বিজ্ঞান

ঐশী ন্যায়বিচার ও মন্দের অস্তিত্ব

ঐশী ন্যায়বিচার ও মন্দের অস্তিত্ব

গোলাম হুসাইন আদিল

ঐশী ন্যায়বিচার এবং পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচারের অস্তিত্বের বিষয়টি ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিকদের মাঝে গত দু'হাজার বছর ধরে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এই মনোযোগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণটি এই যে, মানব জাতি সর্বদাই প্রাকৃতিক ও নৈতিক দুর্দশার শিকার হয়ে এসেছে। ফলত কিছু সংখ্যক দার্শনিক স্রষ্টার ন্যায়বিচার নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; বাকীরা হয় তাঁকে অস্বীকার করেছেন নতুবা দ্বিত্ববাদে আত্মসমর্পণ করেছেন। কেননা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও দয়ালু স্রষ্টা অন্যায়-অবিচার ঘটতে দিতে পারেন– এমন ধারণা মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।[১]

খ্রিস্টান চিন্তাবিদদের মধ্যে দুই ধরনের ঐতিহাসিক ধর্মীয় মত দেখতে পাওয়া যায়। মূল অগাস্টিনীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টজগৎ সকলই কল্যাণকর। কিন্তু আদি পাপের ফলস্বরূপ দুঃখ ও কষ্টের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উদ্ভব ঘটেছে। অপরদিকে আইরিনিয়ান (Irenean) ব্যাখ্যা আত্মা গঠনের প্রক্রিয়ার ওপর গড়ে উঠেছে।

মুসলমান ধর্মতাত্ত্বিকগণের মধ্যে আবুল হাসান আশ'আরি ও তাঁর অনুসারীরা ন্যায়বিচার বা অন্যায়-অবিচারের বিষয়টিকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্রষ্টা যা কিছুই করেন অথবা নির্দেশ দেন তা কল্যাণকর এবং ন্যায়সম্মত, অপরদিকে মুতাযিলা পন্থীরা এবং শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা ন্যায়বিচারকে মুখ্য বিষয় এবং মূলনীতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্রষ্টা কেবল প্রকৃত ভালো ও ন্যায়ানুগ বিষয়ই সম্পাদন করেন ও তার নির্দেশ দেন।

আমরা এ আলোচনায় প্রাথমিকভাবে ঐতিহাসিক অন্যায়-অবিচার বিষয়ক সমস্যাটি এবং ঐশী ন্যায়বিচারের সামগ্রিক ধারণার বিশ্লেষণ তুলে ধরব। অতঃপর আমরা

অগাস্টিনের স্রষ্টার ন্যায়বিচার তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ঐশী ন্যায়বিচারের ধারণা এবং মন্দের অস্তিত্বের ব্যাপারে এর ব্যাপ্তি নিয়ে মনোনিবেশ করব। পরিশেষে, প্রকৃত অর্থে বিষয়টির সুরাহা কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

স্রষ্টার ন্যায়বিচার ও মন্দের অস্তিত্বের সমস্যা

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্রষ্টার ন্যায়বিচারের বিষয়টিকে theodicy (ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্ব) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। Theodicy শব্দটি গ্রীক শব্দ Theos থেকে গৃহীত হয়েছে যা স্রষ্টাকে নির্দেশ করে। ন্যায়বিচারের প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রীক Dike শব্দটি ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় মন্দের অস্তিত্বের বিপরীতে স্রষ্টার ন্যায়বিচার এবং তাঁর ন্যায়নিষ্ঠতা সপ্রমাণে উপস্থাপিত যুক্তিতর্ককে সাধারণভাবে বুঝিয়ে থাকে।

এ কথা যদিও সত্য যে, মন্দের অযৌক্তিক উপস্থিতি স্রষ্টার ন্যায়বিচারের ধারণাকে প্রতিস্থাপিত (বিলীন) করতে সক্ষম নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা যদি মন্দের অস্তিত্বের কারণ অনুধাবনে নিতান্ত ব্যর্থও হই, সেক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে স্রষ্টা কেন তার অনুমোদন দিলেন তা বোঝার জন্য প্রয়াস চালিয়ে থাকি। আর এ প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে স্বভাবতই ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্বের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করে।

মন্দের অস্তিত্ব ও ঐশী ন্যায়বিচার বিষয়ক বিতর্কের খ্রিস্টীয় যুগের শুরুর সময় থেকে এখন পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ১৫শ শতাব্দিতে বিখ্যাত ঐশী ন্যায়বিচার তাত্ত্বিক সেন্ট অগাস্টিন এ বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত মধ্যযুগের বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত, বিশেষ করে ইসলামী কালাম শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ উপস্থাপন করেছেন।

John Hick বর্ণনা করেন :

'প্রচলিত একত্ববাদী নিঃসংশয় বিশ্বাসের জনপ্রিয় ধারণার বিপরীতে মন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক উপস্থিতির আঁচ, খ্রিস্টিয় শতকের প্রথমে দিকেই এবং মধ্যযুগেও আজকের মতোই তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল।'[২]

ঐশী ন্যায়বিচারের বিষয়টি মৌলিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু তা মানব জীবনের বহু সমস্যা, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপরাধ এবং সামাজিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে যেসব অসমতা বিরাজ করে এ ধরনের নানা বিষয়ের সাথে বিজড়িত। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ অভিযোগই এ বিষয়ের অধীনে উত্থাপিত হয়ে থাকে।

অনেকের মনেই এ প্রশ্ন উদিত হয় যে, কেন পৃথিবীর অনেক স্থানই বসবাসের জন্য আতঙ্কজনক, কিন্তু অপর জায়গাগুলো নয়? কেন কেউ দেখতে সুন্দর, কেউ অসুন্দর, কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ। সকলকেই সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে– এ বিষয়টি কি একটি মৌলিক প্রশ্নের জন্ম দেয় না যে, যদি স্রষ্টা ন্যায়বিচারকই হয়ে থাকবেন তাহলে কেন এতসব বৈষম্য বিরাজ করে?

বিষয়টির উভয় দিক লক্ষ্য করলে এবং ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে এর গুরুত্ব এবং কেন এ সমস্যাটির সুরাহা হওয়া প্রয়োজন তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। একজন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য এ ধরনের সমস্যার উত্তম ও তথ্যসমৃদ্ধ উত্তর প্রদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের ঈমান কেবল এ ধরনের বিষয়গুলো মোকাবিলা করা, বোঝা এবং তার সমাধান বের করার মাধ্যমেই আরও দৃঢ় ও শক্তিশালী হতে পারে।

স্রষ্টা যদি ন্যায়বিচারকই হবেন তাহলে এত বৈষম্য কেন?

অনেক মানুষ পৃথিবীতে উদ্বিগ্নতা ও কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করে যা হয়ত প্রকারান্তরে একজন দয়ালু স্রষ্টার অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। আমরা সাধারণত এটি বুঝে থাকি যে, একজন প্রকৃত দয়ালু স্রষ্টার কাজই হলো সকল দুঃখ-বেদনার পরিসমাপ্তি ঘটানো। আমাদের সরলীকৃত চিন্তাভাবনা এই যে, তিনি যদি দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে না পারেন তাহলে তিনি প্রকৃতপক্ষে দয়ালু ও সর্বশক্তিমান হতে পারেন না।

আমরা যদি ধরে নিই যে, স্রষ্টা সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান সত্তা এবং তিনি এ পৃথিবীকে নিখুঁত করে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কি করে মৃত্যু, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, দারিদ্র্য, ক্ষুধা প্রভৃতি দুর্যোগ বিদ্যমান? সুতরাং এ বিষয়গুলো এটাই ইঙ্গিত করে যে, হয়ত স্রষ্টা

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নন অথবা এ সকল মন্দ বিষয়কে তিনি দুর্ঘটনাক্রমে সৃষ্টি করেছেন। ফলত যা তাঁর সর্বজ্ঞানী হওয়ার বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে অথবা এটাই প্রমাণ করে যে, তিনিই মন্দ বিষয়গুলোকে সৃষ্টি করেছেন যা তিনি ধ্বংস করতে চান না।

প্রথাগতভাবে বিভিন্ন উপায়ে এ সংকটের মোকাবিলা করা এবং উত্তর প্রদান করা যায় :

১. স্রষ্টা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং পূর্ণ এবং যেহেতু ন্যায়বিচার পূর্ণতা ও সর্বজ্ঞতার অংশ। সুতরাং স্রষ্টা ন্যায়বিচারক। তাই অবিচার, অজ্ঞতা ও গোঁড়ামি অথবা কোন ধরনের প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। কারাআতির অভিমত অনুযায়ী অবিচারের উৎসসমূহ নিম্নরূপ :

ক. অজ্ঞতা : অনেক সময় না জানার ফলস্বরূপ অবিচার ঘটে থাকে। কিন্তু তা স্রষ্টার ক্ষেত্রে সম্ভব নয় যিনি সমস্ত অপূর্ণতার (যেমন অজ্ঞতা) ঊর্ধ্বে এবং যাঁর জ্ঞান অসীম।

খ. ভয় : অনেক সময় ভয়ের কারণে অবিচার সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তি অপর একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তি, যে তার প্রতিপক্ষ বা শত্রুতে রূপান্তরিত হতে পারে, তার ব্যাপারে শংকিত হতে পারে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কোন প্রতিপক্ষ নেই, সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি এবং তাঁর ওপরই নির্ভরশীল।

গ. প্রয়োজন : কখনও কখনও বঞ্চিত বোধ করার কারণে অন্যায় ও অবিচার ঘটে থাকে, তখন মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে তার চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে অবৈধ উপায় অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু স্রষ্টা কোন ধরনের প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী নন।

ঘ. নীচতা ও হীনতা : মানসিক হীনতা ও নীচতার কারণে অনেকে অপরের ওপর অত্যাচার করে থাকে যার মাধ্যমে তারা এক ধরনের আনন্দ লাভ করে থাকে।[৩] কিন্তু স্রষ্টার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়; বরং স্রষ্টা হচ্ছেন মহানুভব।

যেহেতু উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী স্রষ্টার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় সেহেতু সেই অসীম সত্তা অবশ্যই মুক্ত ও স্বাধীন এবং কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের অগোচর নয়।

২. মানুষের স্বাধীনতাই সকল অবিচারের মূল উৎস।

৩. অবিচার একটি নেতিবাচক বিষয়, কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রয়েছে এবং ভালো ও মন্দের ভিতর থেকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা তার রয়েছে।

এটি সেন্ট অগাস্টিনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ জবাবকে অগাস্টিনের 'ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্ব' বলে অভিহিত করা হয়।

অগাস্টিনের ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সনাতন খ্রিস্টীয় বিশ্বে, অন্যায়-অবিচারের অস্তিত্বের বিষয়ে মূল প্রতিক্রিয়া সেন্ট অগাস্টিনের (৩৫৪-৪৩০ খ্রিস্টাব্দ) কাছ থেকে পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে মূল ধারণাটি হলো এই যে, অন্যায়-অবিচার হচ্ছে একটি নেতিবাচক বিষয়; এক ধরনের ঘাটতি, ক্ষতি এবং ভালো বা ন্যায়ের অনুপস্থিতি।

John Hick এর ভাষ্যমতে :

'অগাস্টিন দৃঢ়ভাবে হিব্রু-খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের অনুসারী ছিলেন, যা এই বিশ্বকে কল্যাণকর হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। অর্থাৎ এটি হচ্ছে একজন ন্যায়বিচারক স্রষ্টার উত্তম উদ্দেশ্য পানে সৃষ্ট এক জগৎ। অগাস্টিনের বক্তব্য অনুযায়ী পৃথিবীতে ভালোর অসংখ্য বিভিন্নতা ও রকমফের বিদ্যমান। যেমন কোনটি উচ্চ পর্যায়ের কোনটি নিম্ন পর্যায়ের, কোনটি পরিমাণে অধিক, কিছু হয়ত অনধিক...

মন্দ কোন কিছু– হতে পারে তা কোন কষ্ট, কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা অথবা প্রকৃতির কোন ক্ষয়, তাই স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট নয়; বরং তা হলো কোন একটি বিষয় যা সহজাতভাবেই ভালো, তার এক ধরনের পথচ্যুতি।

অগাস্টিন এক্ষেত্রে অন্ধত্বের উদাহরণ টেনে এনেছেন। অন্ধত্বের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। যার অস্তিত্ব আছে তা হচ্ছে চোখ– যা সহজাতভাবে ভালো। চোখ যখন ঠিকমত কাজ করতে সক্ষম না হয় তখনই অন্ধত্বের মতো মন্দ বিষয়ের উদ্ভব ঘটে।'[৪]

অগাস্টিনের ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্ব অনুযায়ী স্রষ্টা হচ্ছেন সকল কিছুর উৎস যা তিনি তাঁর ঐশী ইচ্ছা দ্বারা শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। ফলত তা পরিপূর্ণ ও নিখুঁত। বিপরীতক্রমে প্লটিনাসের অভিমত হচ্ছে, মঙ্গল থেকে (ঐশী উৎস) যে যত বেশি দূরে সরে যায় সে ততই অমঙ্গলে নিমজ্জিত হয়। তিনি সর্বোচ্চ সত্তার (এবং তাঁর সৃষ্টির) ভালোত্ব এবং মন্দের বিশৃঙ্খল অবস্থার (যা কোন কিছুর অনস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত) ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

অন্যায়-অবিচার বা মন্দ হচ্ছে সৃজনশীল প্রক্রিয়ার শেষ সীমা– সুমহান সত্তা তাঁর অসংখ্য ও অগণিত অস্তিত্বকে তার সৃজনশীলতা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর এ সকল অস্তিত্ব অনস্তিত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন শূন্যে তার সীমানা বিস্তৃত করেছে।'[৫]

অগাস্টিনের অভিমত অনুযায়ী সকল সৃষ্টিই কল্যাণকর। তাহলে মন্দ বা অকল্যাণের উৎস কী? এর উৎস হচ্ছে ভালোর অনুপস্থিতি যা কোন সত্তা কর্তৃক সৃষ্টিজগতের কাঠামো ও শৃঙ্খলায় তার ভূমিকা অস্বীকার করে নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার অনুসরণের ফলে উদ্ভূত হয়। অগাস্টিন, পাপের একক অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেছেন যা তাঁর মতে কেবল ভালো বা মঙ্গলের অনুপস্থিতি। যা-ই হোক পরিশেষে এ বিষয়টিই প্রতীয়মান হয় যে, স্রষ্টার সাথে সাথে অমঙ্গলেরও অস্তিত্ব রয়েছে যদিও তা ভালোর সাথে এক ধরনের পরজীবীর মতো অস্তিত্বশীল। সকল মন্দেরই কিছু ভালো দিক থাকা আবশ্যক : ভালোর অনুপস্থিতি ব্যতীত মন্দকে আমরা কী বলে অভিহিত করতে পারি? উদাহরণস্বরূপ প্রাণীদেহে অসুস্থতা ও ক্ষত-এর অর্থ হচ্ছে স্বাস্থ্যের ঘাটতি। যখন নিরাময়কারী কোন কিছু সে দেহে কার্যকর হয় সেক্ষেত্রে মন্দ যে বিষয়টি (এক্ষেত্রে অসুস্থতা ও ক্ষত) অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হয় না; বরং তা আর বিদ্যমান থাকে না। আর তাই মন্দ নিজেই কোন আলাদা বস্তু নয়; অসুস্থতা বা ক্ষত এক্ষেত্রে দৈহিক কোন বস্তুর (যা সহজাতভাবেই ভালো) এক ধরনের ত্রুটি।'[৬]

উপরিউক্ত মতবাদ অনুযায়ী যদি মন্দ ও অবিচার কেবল ভালোর অনুপস্থিতি ও অনস্তিত্ব হয়ে থাকে তাহলে কিভাবে তা মানব জীবনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়? এটি যদি এমনই অর্থহীন এক বিষয় হয়ে থাকে তাহলে কিসের জন্য এত বেদনা ও যন্ত্রণা?

এ ধরনের দাবি মন্দ বিষয়ক বিপুল আপত্তির ব্যাখ্যায় যথেষ্ট নয়। তবে এ সকল যুক্তি দ্বিত্ববাদের জবাব হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে যেখানে মন্দ বা অন্যায়-অবিচারকে মঙ্গলের মতোই আলাদা অস্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা প্রকারান্তরে দুই স্রষ্টার ধারণায় পর্যবসিত হয়। সেখানে একজন ভালো ও অপরজন মন্দের প্রতিনিধিত্ব করে।

এ কারণে ধর্মতাত্ত্বিকগণ মন্দকে স্রষ্টার সৃষ্ট কোন আলাদা বিষয় নয় বলে দাবি করেন; বরং তা হলো কোন কিছুর পথচ্যুতি অথবা ভালোর অনুপস্থিতি।

অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন যে, এ বিশ্বজগৎ আমাদের কাছে অপূর্ণ হিসেবে প্রতিভাত হয়, যেহেতু আমরা কোন সংকীর্ণ অথবা বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিকোণ থেকে তা অবলোকন করে থাকি। স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে সকল কিছুই মঙ্গলময় এবং এমনকি আপাত মন্দের উপস্থিতিও সমগ্রের মঙ্গল সাধনে অবদান রেখে থাকে।

অন্য কথায় বলা যায়, ঐশী ইচ্ছায় সকল ধরনের ভালো ও মন্দের স্থান রয়েছে। মন্দ ও অপূর্ণতা বিষয়ক চিন্তা-ভাবনাসমূহ আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমিত জ্ঞানের বিচারে একেবারেই আপেক্ষিক।

Hick বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করেছেন : 'বিশ্বজগৎ সকল অমঙ্গল সহকারেই পূর্ণাঙ্গ।'[৭]

অগাস্টিনের ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্বের কাঠামো স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকেই শুধু ব্যাখ্যা করে না; বরং তা স্রষ্টার পরিপূর্ণ মঙ্গলময়তারও নিশ্চয়তা বিধান করে। সুতরাং প্রাকৃতিক শৃঙ্খলাকে বিবেচনায় নিলে, যদিও কিছু বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তা বৃহত্তর শৃঙ্খলার অংশ, যেখানে প্রকৃতির ক্ষণস্থায়ী বিষয়গুলো নতুন জীবন সূচনাকারী প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। 'আর তাই আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃতিতে কোন কোন বস্তু অপর কোন বস্তুর আগমনের পথ করে দিতে নিঃশেষিত হয় এবং যা অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ভুক্ত তা ক্রমে শ্রেয়তরের সমীপে বিলীন হয়ে যায় এবং এভাবে যা কিছু নতুন গড়ে ওঠে তা পূর্বের চেয়ে অধিক দক্ষ ও যোগ্য হয়ে ওঠে। আর এটাই হচ্ছে এ নিয়মের মর্মার্থ। এই বিশ্ব শৃঙ্খলার সৌন্দর্যের দিকটি আমাদেরকে নাড়া দেয় না। এই

বৃহত্তর শৃঙ্খলার কোন একটি অংশের মাঝে আমরা আমাদের মরণশীল ভঙ্গুরতার দ্বারা এতটাই নিমজ্জিত থাকি যে, আমরা এর পূর্ণাঙ্গ রূপটি দেখতে ব্যর্থ হই।'[৮]

সেন্ট অগাস্টিন বিশ্বাস করতেন, ধার্মিক ব্যক্তিদের কারণেই সকল সুখ ও শান্তি বিরাজ করে। যদিও যা কিছু বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তা পাপীদের কারণে : 'যেহেতু নিষ্পাপ ব্যক্তিদের কারণেই সুখ বিরাজ করে, তাই এ বিশ্বজগৎ পূর্ণ এবং এ কারণে পূর্ণাঙ্গ। পাপীরাই দুর্দশার সম্মুখীন হয় এবং পাপের কারণে শাস্তি তাদের পাপের কলংককে সংশোধন করে।[৯]

এ বিষয়টি সেন্ট অগাস্টিনের ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্বের বিষয়ে প্রশ্নের অবতারণা করে। আর সেটি হলো : 'যেহেতু পাপীর জন্য দুর্ভোগের অস্তিত্ব রয়েছে তাই তা (বিশ্বজগৎ) অপূর্ণাঙ্গ নয়।' অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা ও দুর্ভোগ স্রষ্টার কাছ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ আবির্ভূত হয়। যেহেতু স্রষ্টা তাঁর দাসদেরকে উচ্চ স্তর প্রদানের জন্য পরীক্ষা করতে চান। এই পৃথিবী এমন অনেক উদাহরণ দ্বারা পূর্ণ যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত নানা সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটেছে যা বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষিতে বিশেষ অর্জন হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং প্রচেষ্টা গ্রহণের ক্ষেত্রে পথনির্দেশক ও অনুপ্রেরণা দানকারী হিসাবে বিবেচিত হয়। এ কারণে কখনও কখনও সমস্যা ও দুর্দশা মানুষের পরীক্ষাস্বরূপ এবং তার আত্মার গঠনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়।

John Hick এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন : 'আইরেনিয়ান ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্ব অনুসারে, স্রষ্টার এমন কোন স্বর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল না যেখানে এর অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশি সুখ ও সবচেয়ে কম পরিমাণ কষ্ট ভোগ করবে। এই পৃথিবীকে 'আত্মগঠন' অথবা ব্যক্তি গঠন-এর স্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে যেখানে স্বাধীন অস্তিত্বসমূহ একটি সাধারণ পরিবেশে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 'স্রষ্টার সন্তান' এবং 'অনন্তকালের উত্তরাধিকারী' হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

আমাদের পৃথিবী এর সকল রুক্ষ দিক সত্ত্বেও এটাই দ্বিতীয় এবং কঠিন পর্যায়ের সৃজনশীল প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র।[১০]

'আত্মগঠন'-এর মতবাদ কার্যক্ষেত্রে যথার্থ হলেও প্রকৃত অর্থে অগাস্টিনের নেতিবাচক মতবাদটিই উত্তম এবং বেশ কিছু সমস্যা, যেমন দ্বিত্বতার সমাধান প্রদান

করে। 'আত্মগঠন'-এর মতবাদ বিশ্বাসীদের জন্য যথাযথ প্রমাণ হলেও তা অবিশ্বাসীদের জন্য নয়। তবে 'পাপীর দুর্ভোগ' এবং সকল 'সৃষ্টিই ভালো' এ দু'টি ধারণার মধ্যেও স্ববিরোধিতা রয়েছে। যদি সকল সৃষ্টিই ভালো হয়ে থাকে, তাহলে পাপীদের দুর্ভোগের বিষয়টি বোধগম্য হয় না এবং আর পাপীদের দুর্ভোগের বিষয়টি বোধগম্য না হলে সকল সৃষ্টিই ভালো বলে প্রতীয়মান হয় না, অন্যথায় পাপীদের দুর্ভোগের মতো মন্দ বিষয়ের অস্তিত্ব থাকার কথা নয়।

অগাস্টিনের ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্বে মন্দ ও দুর্ভোগ-দুর্দশার ক্ষেত্রে এক ধরনের গোঁড়া বিশ্বাসের স্পর্শ দেখতে পাওয়া যায়। যা আধুনিককালে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। প্রধানতম সমালোচনাটি Freidrich Schleiermacher এর মতানুযায়ী এ সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, এই বিশ্বজগৎ স্রষ্টা যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবে গঠিত, যেখানে কোন মন্দ বিষয়ের অস্তিত্ব থাকার কথা নয় এবং যা তার পথ থেকেও বিচ্যুত হতে পারে না। অন্য কথায়, একটি পরিপূর্ণ সৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কারণ ছাড়া পথচ্যুত হওয়ার ধারণাটি স্ববিরোধী বলে প্রতিভাত হয়। যা-ই হোক না কেন, যেহেতু মন্দের অর্থ হচ্ছে ভালোর অনুপস্থিতি। সুতরাং তা কারো নিজস্ব স্বার্থ পূরণের ইচ্ছার ফলস্বরূপ উদ্ভূত হয়।

মন্দের অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ, স্রষ্টা স্বাধীন ইচ্ছাকে মূল্য দিয়েছেন এবং স্বাধীন ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই মন্দের সম্ভাব্যতাকে বহন করে। সুতরাং মন্দের অস্তিত্ব স্রষ্টা থেকে নয়; বরং তা আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার অপপ্রয়োগের ফল। এ হিসাবে অগাস্টিনের ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্বে কোন স্ববিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায় না। যেহেতু একটি পরিপূর্ণ বিশ্ব সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যেখানে মন্দের উৎস হচ্ছে মানবকর্ম– যার প্রকৃত উদ্দেশ্য উত্তম কর্ম সম্পাদন।

John Hick এর বক্তব্য অনুসারে এ ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্ব দু'টি মূল স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে– প্রথমটি এই যে, স্রষ্টা যা সৃষ্টি করেছেন তা সবই ভালো; দ্বিতীয়ত স্বাধীন সৃষ্টিসমূহ স্রষ্টাপ্রদত্ত স্বাধীনতার বিকৃত অপপ্রয়োগ দ্বারা স্রষ্টার করুণা বঞ্চিত হয়ে পড়ে যা এ পর্যন্ত সংঘটিত সকল মন্দের আদি উৎস।[১১]

এতদসত্ত্বেও অগাস্টিনের সমালোচনায় John Hick প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, সহজাতভাবে উত্তম কোন সৃষ্টি পাপ করতে পারে কিনা। তিনি বলেন : 'যদি ফেরেশতারা সসীম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এক অর্থে যদিও তাঁদের পাপ করার স্বাধীনতা বিদ্যমান, কিন্তু তাঁরা প্রকৃত অর্থে কখনই তা করেন না।'[১২]

যদি মন্দের অস্বীকৃতিবাচক তত্ত্ব কেবল ভালোর অভাবই হয়ে থাকবে, তাহলে প্রশ্ন থাকে যে, নৈতিকভাবে স্বাধীন সত্তা কেন ভালোর ওপর মন্দকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে? যদি মন্দ, ভালোর অনুপস্থিতি হয়ে থাকে, তাহলে কোন্ জিনিস বিদ্বেষপরায়ণতা ও সুচিন্তিত বিরোধীতার উদ্ভব ঘটায়? অগাস্টিনের ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্ব অনুযায়ী স্রষ্টা সকল ভালোর উৎস, কিন্তু বিচ্যুতিই হচ্ছে সকল দুঃখ ও কষ্টের মূল। তাঁর বক্তব্য মতে স্রষ্টা একটি মনোরম বেহেশত তৈরি করেছিলেন যা ছিল দুঃখ-কষ্ট, মৃত্যু অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগবিহীন। মানুষের অবাধ্যতাই এ সকল কিছুর অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়েছে।

অগাস্টিনের তত্ত্বের ক্ষেত্রে মৌলিক কিছু আপত্তি উত্থাপন করা যায়। যেমন সৃষ্টির বিচ্যুত হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য এবং ফলস্বরূপ তার কষ্টের বিষয়টি ঐশী শাস্তিস্বরূপ বিবেচনা করলেও সাধারণ দুঃখ-কষ্টগুলো ঐশী শাস্তি হিসাবে কি করে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? এটি কি করে ঐশী ন্যায়বিচার তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল? অগাস্টিনের ক্ষেত্রে স্রষ্টা কর্তৃক মন্দ যদিও সৃষ্ট নয়, কিন্তু তা তাঁর সৃষ্টিকূলের সাথে চলে আসা এক ধরনের সহজাত উৎপন্ন বস্তু (by poduct)। অগাস্টিনের তত্ত্ব অনুযায়ী সৃষ্টি জগতের বিচ্যুতিসমূহ যদি পাপী ও মানুষের অবাধ্যতার কারণে হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন থাকে যে, সেক্ষেত্রে নিষ্পাপ কেন শাস্তি ভোগ করে? অগাস্টিনের তত্ত্ব এ প্রশ্নের উত্তর দিতে যথেষ্ট নয়।

যা-ই হোক, এর পিছনে হয়তো স্রষ্টার কোন গোপন উদ্দেশ্য রয়েছে। অগাস্টিনের মন্দের অনস্তিত্বের তত্ত্বের প্রতিধ্বনি ইসলামী কালামশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়।

'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' হিসাবে পরিচিত আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আল-আরাবী (৫৬০/১১৬৫) তাঁর 'আল-ফুতুহাত আল-মাক্কিয়াহ' গ্রন্থে মন্দের অনস্তিত্বের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন।[১৩]

সমসাময়িককালের মহান ইসলামী দার্শনিক আল্লামা সাইয়্যেদ হোসাইন তাবাতাবায়ী তাঁর 'আল-মীযান' ফি তাফসীর আল-কুরআন' গ্রন্থে মন্দের অস্তিত্বকে ভালোর অনুপস্থিতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন : 'সাধারণভাবে খারাপ (মন্দত্ব) এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন ভূমিকম্প, বন্যা এসব কিছুই অনস্তিত্বশীল এবং এ অর্থে ভালোর বিপরীতে এ সকল কিছুর মৌলিক কোন অস্তিত্ব নেই। অসুস্থতা হলো সুস্থতার শূন্যতা, অন্ধত্ব হচ্ছে দৃষ্টিশক্তির অনুপস্থিতি, অন্যায়-অবিচার হলো ন্যায়বিচারের অভাব এবং কদর্য হলো সৌন্দর্যের অনুপস্থিতি।[১৪]

অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত

স্রষ্টার ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে মন্দের অস্তিত্বের বিষয়ে যদি আমরা তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি তাহলে এ সংকট থেকে উত্তরণ লাভ করতে পারি। অধ্যাপক মুহসিন কারাআতি তাঁর গ্রন্থে একটি আকর্ষণীয় বাস্তবতা তুলে ধরেছেন : ঘটনাটি এই যে, একদা এক ব্যক্তি তাঁর শিশুসন্তানকে একটি কুকুরের হেফাজতে রেখে বাজারে গেলেন। ফিরে এসে তিনি কুকুরটির মুখে রক্তের ছাপ দেখতে পেলেন এবং এক মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন যে, কুকুরটি তাঁর শিশুসন্তানকে হত্যা করেছে। তিনি কুকুরটিকে গুলি করে দ্রুত ঘরে গিয়ে দেখেন তাঁর সন্তান বহাল তবিয়তে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ শহরে মাঝে মাঝেই একটি নেকড়ে প্রবেশ করত এবং ঐদিনও ঐ ব্যক্তির ঘর খোলা পেয়ে তাতে প্রবেশ করে, কিন্তু কুকুরটি নেকড়েটিকে শক্তিতে পরাজিত করে হত্যা করে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি অতিরিক্ত তাড়াহুড়ার ফলে তাঁর বিশ্বস্ত কুকুরটিকে হত্যা করে ফেলে। অনুতপ্ত হৃদয়ে লোকটি তাঁর কুকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে করছিলেন, কুকুরটি যেন বলছে : 'হায় মানুষ! তুমি কত তাড়াহুড়াপ্রবণ! প্রথমেই তোমার ঘরে ঢুকে আসল অবস্থা অবলোকন করা উচিত ছিল। তুমি কেন আমাকে হত্যা করলে?' এই দুঃখজনক ঘটনার পর উক্ত ব্যক্তি একটি প্রবন্ধ লেখেন : 'হে মানুষ! সিদ্ধান্ত গ্রহণে তুমি কতই না ত্বরাপ্রবণ!'[১৫]

অধিবিদ্যাগত মতবাদের মাধ্যমে আলোচ্য সংকটের সমাধান করা সম্ভব, কিন্তু পরিশেষে 'মন্দ' একটি ব্যাপক বিস্তৃত বিষয় এবং এর বহু বৈশিষ্ট্যের মূলে বিভিন্ন

কারণ বিদ্যমান। কোন অসুখকর বিষয়ের প্রাথমিক উপলব্ধি বাধ্যতামূলকভাবেই ভাসাভাসা হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রেই আমরা ঘটনার গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হই না এবং আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে অযথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হই এবং তা এ কারণেও যে, আমরা আমাদের প্রাথমিক অনুভূতির বাইরে আর কোন সত্য গ্রহণে প্রস্তুত থাকি না। ফলে আমরা এ বিষয়গুলোকে অবিচারের নিদর্শন হিসাবে বিবেচনা করে থাকি। আমাদের পর্যবেক্ষণ তাই সবচেয়ে অযৌক্তিক বিশ্লেষণের দিকে ঠেলে দেয়।

কিন্তু আমরা যদি সকল ঘটনাকে উন্মুক্ত চিন্তা-ভাবনার সাথে একবারে অবলোকন করতে পারি, তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, এ সকল ক্ষেত্রে আসলে কোন অবিচারের অস্তিত্ব নেই। মন্দের অস্তিত্বের বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তারিত আলোচনা জানতে হলে International Centre for Islamic Studies থেকে প্রকাশিত আয়াতুল্লাহ মোতাহ্হারীর 'ঐশী ন্যায়বিচার' (২০০৭) গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন।

(ঈষৎ সংক্ষেপিত)

অনুবাদ : এস.এম. আশেক ইয়ামিন

তথ্যসূত্র :

1. মন্দ সম্পর্কিত সমস্যা থেকে এসব প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে : কেন অনেক মন্দের অস্তিত্ব রয়েছে? কেন শারীরিক ব্যথা- বেদনা ও মানসিক হতাশা রয়েছে? কেন নিষ্পাপরা কষ্ট সহ্য করে? একজন ন্যায়পরায়ণ স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে কি? কেন তিনি ভালো মানুষকে কষ্টে পতিত হতে দেন?
2. *Evil and the God of love*, Ch 1, p. 3, published by the Macmillan Press Ltd, London 1985.
3. *Lessons from the Qur'an*, published by Rah-e- Haqq, Ch. "Justice," pp. 68 & 69.
4. *Philosophy of Religion*, Ch. "The Problem of Evil," p. 41.
5. Hick, J, *Evil and the God of Love*, Macmillan, pp. 40 & 41.
6. Ibid. p.48.

7. Ibid. p. 84.
8. Ibid. p. 86.
9. *Philosophy of Religion*, Ch. "The Problem of Evil," p. 41 citing from "On Free Will," III, ix. 26.
10. Ibid. pp. 45 & 46
11. Hick, *'Evil and the God of Love',* Macmillan, p. 62.
12. Ibid. p. 63.
13. For example, see Ibn-al-'Arabic *Al-Futûhât al-Makkiyyah*, II 502.21, published in Egypt by Dar al-Kitab al-Arabi al-Kubra.
14. Tabataba'i, Sayyid Muhammad Husayn. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Vol. 1, p. 101.
15. Qara'ati, Muhsin. *Lessons From the Qur'an*, published by Rah-e-Haqq Institute, Ch. "Justice," pp. 77 & 78.

(ইরান থেকে প্রকাশিত Message of Thaqalayn, Summer 2010, vol. 12, no. 2 থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।)

বি.দ্র. প্রত্যাশার পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে এ বিষয়ে আরও প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।